বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব

আমার আমেরিকার অভিজ্ঞতা ; ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির
উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস ;
Studies in Indian Social-polity ; Mystic Tales of
Lama Taranatha

প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ-প্রণেতা

ডাঃ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত
প্রণীত।

ভারত সাহিত্য ভবন
২০৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

মূল্য ১৸৹

ভারত সাহিত্য ভবন
২০৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা হইতে
শ্রীগণেশচন্দ্র দত্ত
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

ইং ১৯৪৫ সাল

প্রিণ্টার—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য
শৈলেন প্রেস
৪, নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব	...	...	১
নিত্যানন্দের কর্ম্ম	...	...	২৪
পরবর্ত্তী যুগ	...	...	২৮
সমসাময়িক সংবাদ	...	...	৩৯
সামাজিক সংবাদ	...	...	৪৩
রাজনীতিক সংবাদ	...	...	৫০
ধর্ম্মবিষয়ক সংবাদ	...	...	৫৩
বৈষ্ণব ধর্ম্মে ইসলামের প্রভাব	...	...	৫৭
চৈতন্যধর্ম্ম ও সহজিয়াবাদ	.	...	৬৫
বৈষ্ণর ধর্ম্মের উদারতা	...	...	৬৮
বৈষ্ণবধর্ম্মে গণ আন্দোলন	...	...	৭০
বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার আন্দোলন	...	...	৭২
ধর্ম্মপ্রচারে সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব	...	...	৭৪
বৈষ্ণবসাহিত্যে বাঙ্গালী "Chauvinism"		...	৭৭
বৈষ্ণবধর্ম্ম ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান	...	...	৮১
বৈষ্ণবসাহিত্যে রাজনীতিক প্রতিক্রিয়া		...	৮২
পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থা	...	...	৮৬
সমাজে প্রতিক্রিয়াশীল প্রচেষ্টা	...	• ...	৯৪
সাধারণের উপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব	...	..	১০৫
চৈতন্যধর্ম্মের প্রসার	...	...	১১৩
বৈষ্ণবসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা	...	...	১২৪

মুখবন্ধ

লেখকের এই ক্ষুদ্র পুস্তক কিছুদিন পূর্ব্বে, বৈশাখ ১৩৪৯ হইতে শ্রাবণ ১৩৫০ বঙ্গাব্দ মধ্যে, "প্রবর্ত্তক" মাসিক পত্রিকায় সর্ব্বপ্রথমে ধারাবাহিকরূপে বাহির হয়। এক্ষণে আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তনের সহিত পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত করা হইয়াছে। এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়টি পৃথকভাবে পাঠ করিলে ইহার ঐতিহাসিক মর্ম্ম উদ্‌ঘাটিত হওয়া সম্ভব নহে। বাঙ্গলাপ্রদেশ বিষয়ে লেখকের বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মধ্যে বৈষ্ণব সাহিত্যের অভ্যন্তরে সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান একটী অংশমাত্র। এই পুস্তক গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাস নহে, ইহাতে কেবল সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান লিপিবদ্ধ আছে। ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে "প্রবর্ত্তক" পত্রিকায় লেখক ধারাবাহিকরূপে "বঙ্গসাহিত্যে সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান" নামক প্রবন্ধাবলী প্রকাশিত করেন। তাহা চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বযুগ পর্য্যন্ত আসিয়া স্থগিত থাকে। তৎপর, চৈতন্যের যুগের সাহিত্য লইয়া এই পুস্তকের প্রতিপাদ্যগুলি উপরোক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ইত্যবসরে, লেখকের 'বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস' ও 'লেখমালায় সমাজতাত্ত্বিক সংবাদ', 'ভারতীয় সমাজপদ্ধতির উদ্ভব' প্রভৃতির আলোচনা বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় এবং পুস্তকরূপে প্রকাশিত হয়। এই সবগুলি একত্রিতভাবে পাঠ করিলে বাঙ্গলার অতীত সমাজতাত্ত্বিক সংবাদ কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাসের সঠিক সংবাদ কেহ অতীতে লিপিবদ্ধ করেন নাই। বাঙ্গলায় সেন রাজবংশের পতনের পর, চৈতন্যযুগের সময়

থেকে যে অভিব্যক্তির দ্বারা বাঙ্গলার হিন্দুসমাজ বর্ত্তমানাকার প্রাপ্ত হ'য়েছে, তাহার কোন ইতিহাস নেই। সে বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধানও হয় নাই, অথচ সাহিত্য মধ্যে কিছু কিছু নির্দ্দেশ আছে। ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকের কর্ম্ম হইতেছে সেই সব তথ্যকে একত্রিত করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দ্বারা ইতিহাস সৃষ্টি করা। সেই উদ্দেশ্যেই বৈষ্ণব সাহিত্য মধ্যে এই অনুসন্ধান প্রয়াস।

তুর্কি-মুসলমান আক্রমণের পরে চতুর্দ্দশ শতাব্দী হ'তে ষোড়শ খৃষ্টীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ও তৎসঙ্গে সমাজ সংস্কার আন্দোলন ভারতের সর্ব্বত্র প্রকট হয়। "শ্রী" সম্প্রদায়ভুক্ত রামানন্দ উত্তরে আসিয়া এই আন্দোলন তথায় প্রবর্ত্তিত করেন। এই আন্দোলন, উত্তর-ভারতে বিপুলাকার ধারণ ক'রে ভারতীয় সমাজকে সময়োপযোগী সংস্কার ক'রে নূতনভাবে সংগঠন কর্ম্মে ব্যাপৃত হয়। এই আন্দোলনকে হিন্দী ভাষায় "সন্ত-আন্দোলন' বলে অভিহিত করা হয়। বাঙ্গলার চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত নব-আন্দোলন ভারতব্যাপী ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবনের নূতন স্পন্দনের ও প্রস্ফুরণের একাংশমাত্র। যাহারা ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী তাঁহারা এই ভারতব্যাপী আন্দোলনের ভিত্তি ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত দেখেন। এই বিষয়ের লেখকের বিস্তারিত আলোচনা পুস্তকাকারে শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

চৈতন্যদেব বাঙ্গলার একজন যুগ-প্রবর্ত্তক। খৃষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর মহাপণ্ডিত চন্দ্রগোমিন হতে আজ পর্য্যন্ত যে সব মনীষী সমাজের উপকারার্থ নানা আন্দোলনের স্রষ্টা হ'য়েছেন, চৈতন্যদেব তাঁহাদের অন্যতম। বাঙ্গলার ইতিহাসের বিবর্ত্তনের ধারা থেকে তাঁহাকে ও তাঁহার কার্য্যকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কিন্তু একদল তাঁহাকে সাম্প্রদায়িক গণ্ডীমধ্যে আবদ্ধ রেখে নানা অলৌকিক গল্পের আবরণে

আচ্ছাদিত করে রেখেছেন, অন্যান্যেরা অজ্ঞতাবশতঃ তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য বিষয়ে অবহিত নন এবং কুসংস্কারবশতঃ "বৈষ্ণব" নামেই নাসিকা সংকুচিত করেন। এইজন্যই চৈতন্যদেবের স্থান ও তাঁহার কর্ম্মের মূল্য ইতিহাসে নির্দ্ধারিত হয় নাই।

বাঙ্গলার লোকসংখ্যা গণনার মধ্যে কত হিন্দু কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত, তাহার তালিকা কখনও প্রদত্ত হয় না। এইজন্য কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুর নিশ্চিত সংখ্যা নির্দ্ধারিত করা অসম্ভব। তবে বিভিন্নজাতীয় হিন্দুদের জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা এই আন্দাজ করা যায় যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু সংখ্যাধিক্যে প্রধান। ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয় তদ্‌বিষয়ে কেহ চিন্তা করেন না। কেবল ভাবপ্রবণতা দ্বারাই লোকসমূহ ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে না: কঠোর বাস্তব জগতে ইহার অন্য কারণ নির্দ্দিষ্ট হয়।

ইতিহাস পাঠে ইহাই প্রতীত হয় যে, প্রাচীন কৌমগত ধর্ম্ম (Animism or Tribal Religion) যাহা "লৌকিক ধর্ম্ম" নামে বর্ত্তমানের হিন্দু ধর্ম্মের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছে তাহা, তৎপর জৈনধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম এবং বেদপ্রসূত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম (Brahmanism), ধর্ম্ম-পূজা, কর্ণাটকগত সেনবংশের রাজত্ব বিস্তারের পূর্ব্বেই বাঙ্গলায় ছিল। গুপ্ত যুগের ব্রাহ্মণ নাথস্বামী ও তাহার স্ত্রী রামী (খাঁটি বাঙ্গালী নাম!), 'শ্বেতবরাহস্বামী', 'নামলিঙ্গ' 'কোকামুখ স্বামী' প্রতিমা বিগ্রহাদি ও তাহাদের মন্দিরের সংবাদ আমরা তাম্রলিপিতে পাই। সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েনসাঙ্গ ভারতভ্রমণ কালে বাঙ্গলার ধর্ম্মবিষয়ে বলিয়াছেন:—নির্গ্রন্থ (জৈন) ধর্ম্মের মঠগুলি সমৃদ্ধিশালী অবস্থায় আছে, আর বৌদ্ধমঠগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'তেছে। ইহার পর শতাব্দীতে বৌদ্ধ ইতিহাস "আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প" বলিতেছে—গোপালদেবের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হবার সময় বাঙ্গলায় বৌদ্ধমঠগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, লোকে

তাহার ইটগুলি কুড়াইয়া বাড়ী নির্ম্মাণ করিতেছে এবং সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত দেশটা তীর্থিকদের (অ-বৌদ্ধ) দ্বারা পরিপূর্ণ। আর ধর্ম্মে গোপালদেব স্বয়ং ব্রাহ্মণ পক্ষীয় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র সম্রাট্ ধর্ম্মপালদেব বৌদ্ধ মতাবলম্বী ছিলেন। এই সময় হতে এই বংশ শেষ সময় পর্য্যন্ত নিজেদের "পরমসৌগত" বলে পরিচয় প্রদান ক'রে গেছেন। তিব্বতের পণ্ডিত লামা তারানাথ তাঁহার "ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস" নামক পুস্তকে বলেছেন, "ভারতে সিদ্ধের আবির্ভাবের কখন অভাব হয় নাই, কিন্তু ধর্ম্মপালের রাজত্ব সময়ের পর সিদ্ধাচার্য্যদের ঘন ঘন আবির্ভাব হয়।" ইহার অর্থ আমরা এই করিতে পারি যে, মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম পুনঃ সঞ্জীবিত হয়; পাল শাসনকালে কিন্তু তাহা "মন্ত্রযান" অর্থাৎ তান্ত্রিক ধর্ম্মরূপে নূতন জীবন লাভ করে। এতদ্দ্বারা আমরা এই বোধগম্য করি যে বাঙ্গলায় তন্ত্রই প্রাধান্য লাভ করে। পরের যুগে, সেন বংশের শাসনকালে আমরা সেই সংবাদই পাই।

লক্ষণসেনদেবের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ তাঁহার "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব" নামক পুস্তকে উল্লেখ ক'রে গেছেন যে, বৈদিক ব্রাহ্মণ ব্যতীত, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা তান্ত্রিক ছিলেন। পুনঃ কথিত হয় যে, তান্ত্রিকধর্ম্মের আনুসঙ্গিক অনেক কদাচার হ'তে লোকদের নিবৃত্ত করিবার জন্য লক্ষণ সেনদেব পণ্ডিত পশুপতি দ্বারা "মৎস্য সূক্ত তন্ত্র" প্রণয়ন করান।

এই সব সংবাদ দ্বারা আমরা এই তথ্য পাই যে, বাঙ্গলায় তান্ত্রিক ধর্ম্মই বিশেষ প্রবল ছিল। বর্ত্তমানকালের অনেক গবেষকের ইহাই অনুমান যে, এই ধর্ম্ম বৌদ্ধেরা প্রথমে প্রচলন করেন, পরে ব্রাহ্মণেরা তাহা গ্রহণ করেন। ব্যাপার এই, উভয় সম্প্রদায়ের তন্ত্রের বাহিরের আকার ও ক্রিয়াকলাপ একই প্রকারের কিন্তু আসল আধ্যাত্মিক দর্শন পৃথক্। যাহাই হউক, তুর্কি-আক্রমণের পূর্ব্বে আমরা বাঙ্গলায় তান্ত্রিকধর্ম্ম,

লৌকিকধর্ম্ম (বাসুলি, মনসা, বৃক্ষ, সর্প প্রভৃতির পূজা), নাথ ধর্ম্ম (১) (ইহা মহাযানের একটী শাখারূপে আরম্ভ হয়—তারানাথের পুস্তক সমূহ দ্রষ্টব্য) ও পশ্চিম বঙ্গে নিরাকার বাদীয "নিরঞ্জনের পূজা" যাহা "ধর্ম্ম ঠাকুরের" পূজা নামে খ্যাত হয়, তাহা ছিল। এই সবের সঙ্গে বিজেতৃবর্গের দ্বারা আনীত ইসলামও বঙ্গে প্রচলিত হয়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ধর্ম্ম ও সমাজের এই সমাবেশ ছিল।

এক্ষণে দৃষ্ট হয় যে, বাঙ্গলায় কেবল তথাকথিত হিন্দুধর্ম্ম ও ইসলাম বর্ত্তমান আছে। চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সমাজ আসলে বাহির হতে আগত। ধর্ম্ম ও সমাজক্ষেত্রে এই আশ্চর্য্য পট-পরিবর্ত্তন কি প্রকারে হল, তাহাই এখন গবেষণার বস্তু হয়েছে। এই বিষয়ে নানামতও উপস্থাপিত হয়েছে। এই মতগুলি এক বিষয়ে ঐক্য স্থাপন করে যে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও তাহার ছায়ায় অবস্থিত যে সব সম্প্রদায়গুলি বাঙ্গলায় বর্ত্তমান ছিল তাহার একাংশ মুসলমান সমাজে প্রবিষ্ট হয়েছে। এই বিষয়ে ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন: "যে দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের এত নিবিড় প্রভাব ছিল, সে দেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম লুপ্ত হইল কেমন করিয়া—এই প্রশ্ন অনেকেরই মনে উঠিতে পারে।...মোটের উপর বাঙ্গলার বিশাল হিন্দু ও মুসলমান মণ্ডলী এই বৌদ্ধগণকে গ্রাস করিয়া লইয়াছে।...মুসলমানগণের মধ্যে যাহাদিগকে বেদাতী ফকীর (আরবী, বিদ-আৎ-নূতনত্ব, নবসৃষ্টি) বা নেড়ার ফকীর বলা হয়, তাহাদের মধ্যে অনেকটা সহজসিদ্ধির ভাব দেখা যায়। আমার মনে হয়, সত্যপীর নিরঞ্জনের এবং মাণিক্যপীর গোরক্ষনাথেরই প্রকারভেদ"।২

১। B. N. Datta. "Mystic tales of Lama Taranatha" দ্রষ্টব্য।

২। "শূন্য -পুরাণ": শ্রীচারু চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ডাঃ শহীদুল্লাহ লিখিত ভূমিকা, পৃঃ ১—৩।

নাথ-পন্থীয় লোকেরা যে উত্তর-ভারতের সর্ব্বত্রই মুসলমান সমাজে প্রবেশলাভ করেছে তাহার সন্দেহ নাই। নাথ পন্থীয়েরা নিজেদের "জুগী" (যোগী) বলেন, এবং এক সময়ে বস্ত্র-বয়ন করাই তাঁহাদের বৃত্তি ছিল এবং এখনও অনেকস্থলে আছে। ইহারাই মুসলমান হ'য়ে "জোলাহা" নাম গ্রহণ করেন। এই শব্দটি ফার্শী ভাষা উৎপন্ন, ইহার অর্থ তাঁতী। কথায় বলে, "জুগী জোলা"! আশ্চর্য্যের কথা—হিন্দুসমাজে এই ভূতপূর্ব্ব বৌদ্ধধর্ম্মাব তাঁতী শ্রেণী যে সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি ক'রেছে, মুসলমান সমাজেও এই শ্রেণীর "জোলাহা" নাম ধারণ করিলেও সেই সামাজিক সমস্যার অনেকাংশ বিদ্যমান আছে। ইহারই ফলে আজ মুসলমান সমাজে "মোমীন আন্দোলন" উদ্ভূত হয়েছে। পুনঃ "কাণ-কট্টা" যোগীদের ব্যাপারে এই সন্দেহ ধরা পড়ে। শ্রুত হওয়া যায় তাহাদের মধ্যে একটা শিশুর জন্ম হলে, গোরক্ষপুরের গোরক্ষনাথের মন্দিরে তাহাকে লইয়া গিয়া মন্ত্রপূত করা হয়। আবার তাহারা মুসলমানের কাছে "মুসলমান" এবং হিন্দুর কাছে "হিন্দু" বলে পরিচয় প্রদান করে। অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীত হবে যে, উত্তর-ভারতে হিন্দু রাজত্বের অবসানে, পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে শিল্পিশ্রেণীদের অনেকেই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে। তথাচ তাঁহারা নিজেদের পূর্ব্বতন জাতিগত পঞ্চায়েৎ প্রথা ত্যাগ করেন নাই (গেটের রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)। মুসলমান সমাজতত্ত্বের গবেষণার ফল যাহাই হউক না কেন, বাঙ্গলার হিন্দু সমাজের পরিবর্ত্তন বিষয়ের অনুসন্ধান এই ক্ষেত্রের লক্ষ্য।

এই বিষয়ে হিন্দুর কোন লিখিত পুস্তক নেই। কিন্তু আমরা দেখি চৈতন্যদেবের সময়ের পর বাঙ্গলায় বৌদ্ধ নাম বিলুপ্ত হয়েছে; এক্ষণে ব্যবসায়জীবী, শিল্পজীবী এবং কৃষিজীবী হিন্দুরা সংখ্যাধিক্যে বৈষ্ণব আর বাকী মুষ্টিমেয় লোক শাক্ত। ইহাও লক্ষ্যের বিষয়, বর্ত্তমানের

জাতীয় লোকেরা নিজেদের প্রাচীন নাথ সম্প্রদায়ভুক্ত বলে অস্বীকার করেন, এবং তাঁহারা আজ গৌড়ীয় বৈষ্ণব। তদ্রূপ, ধর্ম্মপূজাও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। এই ঘোর বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন কি প্রকারে সংসাধিত হল তদ্‌বিষয়ে এই পুস্তকে অনুমান করা হ'য়েছে।

হিন্দু সমাজের ধর্ম্মক্ষেত্রে এই যে বিশাল পরিবর্ত্তন, তাহা চৈতন্য প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় দ্বারা বিশিষ্টভাবে সংসাধিত হয়েছে ইহা বলা যেতে পারে। পুনঃ প্রচারক্ষেত্রে সকল ধর্ম্ম যাহা করে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মও তাহা করিয়াছে অর্থাৎ অন্য সম্প্রদায়কে গ্রাস করিবার কালে তাহার পুরাতন আচার, ব্যবহার এবং বিশ্বাস অনেকাংশে জীর্ণীভূত করিয়াছে। ইহাই অনুমান করা যেতে পারে, বৈষ্ণব সমাজের নামের সহিত বিজড়িত অনেক আচার ও অনুষ্ঠান যাহা আজকাল আপত্তিজনক "কদাচার" বলে বিবেচিত হয়, তাহাও এই প্রকারে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে। এই সব আপত্তিজনক অনুষ্ঠান শিক্ষিত বৈষ্ণব সমাজে উঠিয়া গিয়াছে ; কিন্তু অশিক্ষিত ও নিম্নস্তরের সামাজিক শ্রেণীদের মধ্যে আছে বলে এখনও শ্রুত হওয়া যায়। এই সব ব্যাপারকে অস্বীকার করা বা বাঙ্গলায় কখন ছিল না বলে উড়াইয়া দেওয়া বা লোকলজ্জাভয়ে 'ধামাচাপা' দেওয়া সুদৃঢ় মনোবৃত্তির পরিচায়ক নহে।

ভারত নূতন যুগের এক সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হতেছে। নূতন ভারত সৃষ্টির পরিকল্পনা হইতেছে, নূতন ভারতীয় সমাজ গঠনের স্বপ্নও অনেকে দেখিতেছেন। এইজন্য, সমাজের গলদসমূহ আবিষ্কার ক'রে তাহা সমূলে উৎপাটন করা প্রয়োজন। সমাজতাত্ত্বিকের কর্ত্তব্য এই যে সমাজের অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সমূহের উৎপত্তির কার্য্যকারণ নিরূপণ করা। কিন্তু এই দেশে এই বিষয়ে আলোচনা করিতে গেলে লোকের বিরক্তিভাজন হতে হয়। এ দেশের লোকের মন সর্ব্ব বিষয়েই সনাতনবাদীয় অর্থাৎ

তাঁহারা মনে করেন, দেশের বা সমাজের সর্ব্ব অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান শাশ্বত ও অপরিবর্ত্তনীয়। সমাজ যে গতিশীল ও পরিবর্ত্তনশীল এই কথা এখনও শিক্ষার ভিতর দিয়ে জনসাধারণকে বুঝান হয় নাই। তৎপর, এই দেশে যে কিছু সংগঠন সৃষ্টি হউক না কেন, তাহা অল্প সময়ের মধ্যে বনিয়াদী বা কায়েমী স্বার্থে পরিণত হয়। আর সেই স্বার্থকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে "সনাতন" ও "ঈশ্বর প্রদত্ত" বলে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হয়।

আজ চৈতন্যদেব ও তাঁহার সংস্কারের ফল এক শ্রেণীর লোকদের "বনিয়াদী স্বার্থ"রূপে পরিণত হয়েছে। তজ্জন্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণবান্দোলনের বিষয়ে কিছু আলোচনা করিলে এবং প্রচলিত বৈষ্ণব বিশ্বাস ও সংস্কার বিষয়ে কিছু গবেষণা করিলে তাঁহারা অসহিষ্ণু হন এবং গালাগালি করেন। আসল কথা এই, সমাজতাত্ত্বিক তুলনামূলক গবেষণাদ্বারা আসল কথাটা ধরা পড়িলে, তাঁহাদের কায়েমী বনিয়াদী স্বার্থে আঘাত পড়ে অর্থাৎ যাহাকে বলে—রুটি রোজগারের পন্থায় হাত পড়ে। অবশ্য সকল ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীদের বিষয়ে এই কথা প্রযোজ্য। ঐতিহাসিক গবেষণাকালে অনেক অপ্রিয় আলোচনাই হয়। কাহারও স্বার্থে আঘাত লাগিবে বলে অনিসন্ধিৎসু ব্যক্তি তাহার কার্য্যে নিরস্ত হন না।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের উৎপত্তি এবং তাহার প্রসার সম্বন্ধে অনুসন্ধানকালে লেখক নবদ্বীপের কতিপয় বৈষ্ণব গোস্বামী পণ্ডিত এবং স্মার্ত্ত পণ্ডিতের সহিত আলাপ করেছেন। এতদ্ব্যতীত আরও বৈষ্ণব সাহিত্যিক ও অনুসন্ধানকারীদের সহিত আলাপ করেছেন। ইহা ছাড়া, বিভিন্ন আন্দোলন সম্পর্কে গ্রামাঞ্চলসমূহে পরিভ্রমণকালে কৃষিজীবীদের কাছ হতে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করেছেন।

এই পুস্তক প্রণয়নকালে যথাসম্ভব প্রামাণিক বৈষ্ণব সাহিত্য হতে

তথ্য সংগ্রহ করা হ'য়েছে। এই স্থলে "চৈতন্য-ভাগবত" হতে যাহা উদ্ধৃত করা হ'য়েছে, তজ্জন্য গৌড়ীয় মঠের সংস্করণ ব্যবহৃত হ'য়েছে।

পরিশেষে ভারত সাহিত্য ভবনের পরিচালক মহাশয়ের কাছে লেখক ঋণী। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকাশ করার জন্য লেখক তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছেন। ইতি—

২রা নভেম্বর ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ
৩নং গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

গ্রন্থকার

বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব

[১]

বৈষ্ণবমত ও পন্থা ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিদ্যমান আছে। কেহ কেহ বলেন, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডাবলম্বী মতের বিপক্ষে যেসব অহিংসাবাদী মতসমূহ উত্থিত হইয়াছিল, বৈষ্ণবমত তাহাদের অন্যতম। ওয়েবারের[১] মতে এই অহিংসাবাদী বৈষ্ণবমতাবলম্বীদের 'ভাগবতের দল' বলা হইত। ইহাঁরাই পরে 'পঞ্চরাত্রের দল' বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিলেন। খৃঃ চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্তসম্রাটদের বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী হইতে দেখা যায়। জয়সোয়ালের[২] মতে ভারশিব ও ভাকাটাকা সম্রাটদের কঠোর শৈবধর্ম্মের প্রভাবের পর "পরম ভাগবত" গুপ্ত সম্রাটদের বৈষ্ণবমত দেশে কঠোরতার বিপক্ষে এক প্রতিক্রিয়া আনয়ন করে। এই সময়কার বৈষ্ণবধর্ম্ম ভোগ-সুখেচ্ছু হাস্যময় ধর্ম্ম, যাহার কৃষ্ণ ছিল কংসারি মধুকৈটভারি। গুপ্তসম্রাটদের এই বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্যমতাবলম্বী

(১) Weber, —"History of Sanskrit Literature"

(২) K. P. Jayaswal,—History of India Circa, 150 A. D. to 350 A. D. in J. B. O. R. S. Vol. XIX. Pts. 1—II, March—June, 1933.

এবং ঘোর আক্রমণশীল (aggressive) জাতীয়তাবাদী ছিল। এই সময়ে শক ও অন্যান্যজাতির শাসন, গুপ্তরাজগণ দেশ হইতে সমূলে উৎপাটিত করেন এবং মরৌলী প্রস্তরশাসনানুসারে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য) সিন্ধুনদের পঞ্চশাখার উৎপত্তিস্থল[৩] (বোধ হয়, বাল্‌হিক দেশ) জয় করেন। কাহারও কাহারও মতে, কালিদাস-বর্ণিত রঘুর হূন-পারসীকদের দেশ জয় করা এই মরৌলির সংবাদের প্রতিধ্বনি করে।

সংস্কৃত ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত, হরিবংশ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক অনেক পুস্তক লিখিত হইয়াছে; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতী রাধিকার প্রেমবিষয়ক কবিতা প্রথম পাওয়া যায় জয়দেবে। বাংলার রাজা লক্ষ্মণসেনের সভায় জয়দেব একজন কবি ও গায়ক ছিলেন। জয়দেব সম্বন্ধে বাংলার বৈষ্ণবদের ভিতরে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। তাঁহারা জয়দেবকে "গোস্বামী" বলিয়া অভিহিত করেন। এমন কি, হালের কোন কোন বৈষ্ণব ভক্ত তাঁহার জপমালা আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া তথাকথিত-মালা দর্শকদের দেখান*। কিন্তু হালের আবিষ্কৃত "সেখ শুভোদয়া" নামক সংস্কৃতগ্রন্থে যদি কিছু সত্য আছে বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে উক্ত গ্রন্থে অন্য প্রকারের সংবাদ দৃষ্ট হয়। তথায় দৃষ্ট হয়, পদ্মাবতী লক্ষ্মণসেনের সভায় নৃত্য করিতেন এবং জয়দেব একজন গায়ক ছিলেন। "পদ্মাবতীচরণচারণ-চক্রবর্ত্তী" পদে পাওয়া যায় যে, ইনি নৃত্য করিতেন এবং জয়দেব তার তাল রক্ষা করিতেন[৪]। এই জয়দেব সংস্কৃতভাষার দশ অবতার স্তোত্র লেখেন।

(৩) জয়চন্দ্র নারং,—"ইতিহাস প্রবেশ" (হিন্দী)।

* একটা সুতায় গাছের গুঁড়ির এক টুকরা, তৎপর একটা মালার দানা, তৎপর একটা গুঁড়ির টুকরা, এই প্রকারে একটা মালা গাঁথা, লোকদের জয়দেবের "জপমালা" বলিয়া দেখান হয়। লক্ষ্মণসেনের সময়ে কি একটা মালা তৈয়ার করিবার শিল্পীরও অভাব হইয়াছিল?

(৪) ৺দীনেশচন্দ্র সেন,—"বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পৃঃ ২০২

তথায় কৃষ্ণকে কেশী-মুর প্রভৃতি নাশন বলা হয়। জয়দেবের কৃষ্ণ গুপ্ত-যুগের কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ নহেন, তিনি যোদ্ধা কৃষ্ণ। তৎপর তাঁহার শেষ পদে কল্কি অবতারের বিষয়ে তিনি বলিয়াছেন,—"ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্"। তারপরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত তাঁহার বিখ্যাত গীতিকাব্যে কৃষ্ণ ও শ্রীমতীর প্রেম বিষয়ে যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার খ্যাতি আজ পর্য্যন্ত ভারতব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই পুস্তক সংস্কৃত সাহিত্যে একটী অতি উৎকৃষ্ট lyric কাব্য। এই সময়ে বাংলায় সংস্কৃত ভাষায় রচিত আরও অনেক কাব্য পাওয়া যায়। এই সময়ে বোধ হয় প্রেম-কাব্যের খুব ছড়াছড়ি বাংলায় হইয়াছিল। ভিক্টর হুগোর বিভাগানুযায়ী এই সময়কে বাংলার ইতিহাসের একটী lyric যুগ বলা যাইতে পারে। হিন্দী সাহিত্যিকেরা বলেন, বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রথম লেখক হইতেছেন জয়দেব। শিখদের "গুরুগ্রন্থসাহেবে[৫]" জয়দেবের একটী হিন্দী কবিতা সন্নিবেশিত আছে। তাহার একটী নমুনা দেওয়া হইল :—

রাগ মারু

"চন্দসত ভেদিয়া নাদসত পুরিয়া ছুরসত খেড় সাদতুকীন্না
অবলবলু তাড়িয়া অবলুচলু আপিন্না অঘড়ু ঘড়িয়া তহা অপিউ পীয়া॥
* * * *
বদতি জয়দেব জয়দেব কৌ রে°মিন্না ব্রহ্মনির্বাণ লবলিণ পাইয়া।"

জয়দেবের কবিতায় নিবৃত্তির কথা নাই, ভোগের কথাই আছে। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ যেমন যোদ্ধা, তেমনি প্রেমিক, তত্রাচ তিনি ধনুর্দ্ধর। শ্রীমদ্ভাগবতে রাধা নাই, এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে রাধা হ্লাদিনী শক্তি হিসাবে চিত্রিতা হইয়াছেন। জয়দেবের শ্রীমতী শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়িনী, কিন্তু তিনি গেরুয়াপরা সন্ন্যাসিনী নহেন। জয়দেব হিন্দু-বাংলার সুখসমৃদ্ধির সময়কার কবি ছিলেন। তিনি সেই "পঞ্চগৌড়েশ্বর" লক্ষ্মণ-

(৫) "আদি শ্রীগুরুগ্রন্থ সাহেবজী" (মোহন সিং)—পৃঃ ৫৭৮ দ্রষ্টব্য

সেনের রাজসভাসদ্ ছিলেন, যাঁহার বিষয়ে প্রস্তরফলকসমূহ সগর্ব্বে সাক্ষ্য দিতেছে যে, ইনি যৌবনে কলিঙ্গদেশের যুবতীগণের সহিত জলক্রীড়া করিয়াছেন, গৌড় জয় করিয়াছেন, কাশীর রাজাকে পরাস্ত করিয়াছেন এবং প্রয়াগে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন[৬]। তখনকার বাংলার সামাজিক অর্থনীতিক চিত্র জয়দেবের গীতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। দীনেশ-বাবু যথার্থই বলিয়াছেন, "বিজয়সেনের প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের নিকটবর্ত্তী প্রমোদোদ্যানে অভিসারিকাগণ মুখর নুপুর ত্যাগ করিয়া নীলাম্বরী ও মেঘডুম্বুর সাড়ী আঁধার রাত্রির সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া 'বাধি তাম্বূল আঁচলে' যে লীলা করিয়াছিলেন, জয়দেবের চক্ষে ছিল সেই দৃশ্য"[৭]। অবশ্য জয়দেবের রচনার মধ্যে রাজনীতিক বা সামাজিক কোন সংবাদ পাওয়া যায় না; কিন্তু বিভিন্ন স্থান হইতে যে-সংবাদ এই যুগে পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে, lyric-এর স্রোতঃ তখন বাংলায় বহিতেছিল, তাহার অব্যবহিত পরেই বাংলার হিন্দুর পক্ষে এক বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় আরম্ভ হয়।

জয়দেবের পর আসেন চণ্ডীদাস। তিনি যখন আবির্ভূত হন, তখন বাংলায় আর এক নাটকের অভিনয় চলিতেছিল। চণ্ডীদাসকে বাংলাভাষায় প্রথম বৈষ্ণব কবি বলিতে পারা যায়। চণ্ডীদাস সম্ভবতঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে বাংলার হিন্দুরা বিজিত জাতি এবং অন্যধর্ম্মাবলম্বী দ্বারা কঠোরভাবে শাসিত। এই সময়ে ইউরোপীয় পর্য্যটক বাবের্বাসা বাংলাদেশ দেখিয়া বলিয়া গিয়াছেন, "বাঙ্গালীরা হুড় হুড় করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছেন — এমন কি, রাজারাও সামান্য প্রলোভনে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে।" সেই সময়ে হিন্দুর ঘরের লোক ভিন্ন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাহার পর হইতেছে। আর

(৬) Fpigraphica Indica, Vol. 3.

(৭) "বৃহৎ বঙ্গ",—২য় খণ্ড,—পৃঃ ১১৮—১১৯

এই সময়ে সেন রাজাদের প্রতিষ্ঠিত নব-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তখন হিন্দু রাষ্ট্র হারাইয়া খাদ্যাখাদ্য, স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্য এবং জাতিভেদের বিষয় লইয়া ব্যস্ত। চণ্ডীদাসের জীবনীতে তাহার ছাপ পাওয়া যায়। রজকিনী রামীর প্রেমের জন্য চণ্ডীদাস সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের পিতা "বাসুলীদেবীর" পূজক ছিলেন। এই বাসুলীদেবী বৈদিকদেবীও নহেন, পৌরাণিক দেবীও নহেন,—হয়ত বৌদ্ধযুগের শেষ সময়ের কোন লৌকিক গ্রাম্য দেবী, যাহাকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম হজম করিয়াছেন। কোন বাদসাহের হুকুমানুযায়ী তাহার মৃত্যুদণ্ড হয়,—চণ্ডীদাসের মৃত্যুবিষয়ক এই জনশ্রুতি হালের আবিষ্কৃত রামীর গীতিকা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে[৮]। এই গীতিকা চণ্ডীদাসের মৃত্যু বিষয়ে জনশ্রুতিকেই অনেকটা সমর্থন করে; যথা,— গৌড়ের বাদশার বেগম চণ্ডীদাসের গান শুনিয়া মোহিত হইয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হন। ইহাতে বাদশাহ চণ্ডীদাসকে হস্তিপৃষ্ঠে বাঁধিয়া জর্জ্জর প্রহারে মারিয়া ফেলেন,—

—"রাজা গৌড়েশ্বর, দুষ্ট কলেবর, কেহ না বুঝালো তাকে॥

*　　*　　*　　*

সুদ্ধ কলেবর হইল জর্জ্জর দারুণ সঙ্কান ঘাতে।

*　　*　　*　　*

চণ্ডীদাস করি ধ্যান, বেগম ত্যজিল প্রাণ।
সুনি শ্রুত্বা ধবিনি ধায়, পড়িল বেগম পায়॥"

ইহাতে এই তথ্য জানা যায় যে, হৃদয়ের আবেগ ধর্ম্ম বা সমাজের বিধি-নিষেধ মানিয়া চলে না।

চণ্ডীদাসের লিখিত "কৃষ্ণকীর্ত্তন" নামে আর একটি পুস্তক আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পুস্তকটি সুরুচিপূর্ণ নহে। এই সম্বন্ধে পরলোকগত দীনেশবাবু বলেন, "রাজসভায় যে ভাববিকার আরম্ভ হয়—সমাজের নিম্নস্তরে তাহা যখন আসিয়া পৌঁছায়—তখন তাহা অতি বিকট হয়......

৮। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য। পৃঃ২০৯-২১২।

সেই সময় হইতে আগত এক শ্রেণীর গান আমরা রংপুর, কুচবিহার ও দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে পাইতেছি, তাহার নাম কৃষ্ণ-ধামালী। ইহা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—এক শ্রেণীর নাম "আসল", ও অপর শ্রেণীর নাম "শুকুল" (শুক্ল)····· শুক্লা ধামালীকে সুন্দর করিয়া সাধু-ভাষায় প্রবর্ত্তিত করিয়া, কবিত্বমণ্ডিত করিয়া চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্ত্তন লিখিয়াছিলেন। যদি কৃষ্ণকীর্ত্তন না পাইতাম, তবে বুঝিতাম না গীতগোবিন্দ ও কৃষ্ণধামালির পরেই হঠাৎ চণ্ডীদাসের অভ্যুদয় কি করিয়া হইয়াছিল[৯]। দীনেশবাবু হইতে এই সংবাদ অবগত হওয়া যায় যে, চণ্ডীদাসের পূর্ব্বেও বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে অমার্জ্জিত রুচি-সম্মত ভাষায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী গীত হইত।

এক্ষণে চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে কি সংবাদ পাওয়া যায় তাহা অনুসন্ধান করা যাক্। চণ্ডীদাস তাঁর "দশাবতার" নামক কবিতাতে বলিতেছেন,—

"পুন তা ত্যজিয়া কল্কি অবতার ধরেন মূরতি কায়া।
অশ্বের উপরে ধরে দুই করে সংহার অনুপ ছায়া" ॥১০

এইস্থলে দেখা যায়, যেখানে জয়দেব "ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্······" বলিয়া গর্জ্জন করিয়াছেন, সেখানে চণ্ডীদাসের সুর কত নামিয়া গিয়াছে। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, বিজিত বাঙ্গালীর মনে ও চিন্তাতে বিজেতা শাসকবর্গের Censor বড় জোরেই ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিজেতার এই Censorship যে কত কঠোর ছিল, তাহা চণ্ডীদাসের এই লেখা ও শোচনীয় মৃত্যুতে প্রমাণিত হয়। তৎপরে আসে তাঁর বিখ্যাত পদাবলীর ভাষা,

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
* * * *
সাগর শুকাল মাণিক লুকালো অভাগীর করম দোষে।"

৯। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য পৃঃ ২০২।২০৩।
১০। "বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী"—১ম খণ্ড—পৃঃ ১৭

একদিকে যেমন এই গান একজন প্রেমবিরহিণীর মুখ হইতে বাহির হইতে পারে, তেমনি একজন ভগ্নহৃদয় রাজনীতিক বৈপ্লবিকের মুখ হইতেও বাহির হইতে পারে।

ইহার পর, চণ্ডীদাস রাধাকে রাঙাবসন পরিহিতা যোগিনী সাজাইয়াছেন,

"বিরতি আহারে, রাঙা বাস পরে
যেমন যোগিনী পারা"

বৃন্দাবনের শ্রীমতীকে যোগিনী সাজাইবার দৃষ্টান্ত এই প্রথম পাওয়া গেল। তৎপরে আর একটি অনুষ্ঠানের কথা পাওয়া যায় তাহা "মাথুর"। পরবর্ত্তী বৈষ্ণবকবিগণ তাহাকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন। চণ্ডীদাসের সমস্ত পদাবলী পড়িলে রাধার কৃষ্ণবিরহে ক্রন্দন শুনিয়া ইহা কৃষ্ণপ্রেমের পরাকাষ্ঠা ভাবিয়া ভক্ত তৃপ্ত হন বটে, কিন্তু অন্য দৃষ্টিভঙ্গীতে এই পদাবলী পড়িলে ইহাও মনে হয় যে, একটা হতাশ বেদনা ও একটা হাহাকারের ধ্বনিও ইহার মধ্য হইতে বাজিয়া উঠিতেছে। কবির অবিদিত মনের (unconscious mind) পশ্চাতে কি কি ইচ্ছা (urges) জাগ্রত ছিল, তাহা কে নির্দ্ধারণ করিবে? বাংলার হিন্দুর পরাধীনতার যুগের প্রথম কবির মুখ হইতে কেবল হতাশ মনোবেদনার কথাই শুনা গেল!

২

এই সময়ে আর একজন বড় কবি ছিলেন, বিদ্যাপতি। তিনি ছিলেন একজন মিথিলাবাসী, কিন্তু বাঙ্গালীরা তাঁকে আপনার করিয়া লইয়াছে। বর্ত্তমানযুগে হিন্দী সাহিত্যিকেরা তাঁহাকে হিন্দীভাষার কবি বলিয়া বড়াই করিতেছেন[১১]। কিন্তু ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, Alexander-এর

(১১) শুক্ল—"হিন্দী সাহিত্যকা ইতিহাস।"

আমল হইতে কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মিথিলা বাংলার সঙ্গেই এক রাজনীতিকভাগ্যের যোগসূত্রে আবদ্ধ ছিল। গুপ্তযুগে মিথিলা ও বঙ্গ এক "গৌড়চক্রের"[১২] অধীন ছিল। প্রাচীনকালে মিথিলা, মগধ ও বাংলার মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য ছিল, তাহারই বা প্রমাণ কি? সেন রাজাদের আমলে মিথিলা বাংলার একটি প্রদেশ ছিল এবং আজও কৃষ্টির দিক্ দিয়া উভয় প্রদেশের মধ্যে অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। তৎপর মিথিলা ও বাংলা ভাষার উৎপত্তি একস্থল হইতেই। উভয় ভাষাই মাগধীপ্রাকৃত প্রসূত। অন্যপক্ষে আজকাল যাহাকে হিন্দীভাষা বলা হয়, তাহার ভিত্তি দিল্লীর "খড়িবোলীর" উপর প্রতিষ্ঠিত। এই "খড়িবোলীতেই" ফার্সী শব্দ প্রবিষ্ট করাইয়া উর্দ্দূ ভাষার সৃষ্টি করা হইয়াছে, এবং বর্ত্তমান সময়ে এই "খড়িবোলীতেই" বহু বিদেশী শব্দ বাদ দিয়া এবং সংস্কৃতবহুল শব্দ প্রবেশ করাইয়া বর্ত্তমানের হিন্দীসাহিত্য সৃষ্ট হইতেছে। এইজন্যই ইহা একটি রাজনীতিক দ্বন্দ্বের আবর্ত্তে ঘুরিতেছে। এই উভয় ভাষাকেই ইংরাজেরা "হিন্দুস্থানী" ভাষা বলেন। এই "খড়িবোলী" প্রসূত হিন্দুস্থানী ভাষার সহিত বিদ্যাপতির ভাষার সম্পর্ক অতি কম। ঐতিহাসিক এবং কৃষ্টিগত সম্বন্ধের দিক্ দিয়া বিচার করিলে বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালী বলিলে অপরাধ হয় না। যাহাই হউক, বৈষ্ণব পদাবলীতে বিদ্যাপতির স্থান যখন আছে, তখন তাঁহাকে এই স্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কিন্তু পণ্ডিতদের মত যে, বাংলার বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহার কবিতাকে বাংলার ছাঁচে ঢালিয়া লইয়াছেন। বিদ্যাপতির পদাবলীতে হাহাকাররূপ ক্রন্দনের রোল পাওয়া যায় না। তাঁহার নায়িকা বা শ্রীমতী বরঞ্চ ইংরাজীতে যাহাকে aggressive typo of woman বলে, তিনি তাহাই। প্রথমেই তিনি আরম্ভ করিতেছেন,—

(১২) "আর্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প"।

"গেলি কামিনী গজহুগামিনী বিহসি পালটি চায়"[১৩]। তৎপরে তার রূপবর্ণনা প্রসঙ্গে কবি বলিতেছেন, "তুহারী ভয়ে সব দূরে পলায়ল" ইত্যাদি। এইসব পদাবলীতে নায়িকাকে আর এক ধরণে দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য বিদ্যাপতিতেও এরূপ পাওয়া যায়—যেমন, "করব মোয়ে তঁহা যোগিনী বেশ (পদ ১৪৬)"। আবার ইহাও পাওয়া যায়[১৪] "দেশে দেশে ভরমিব যোগিনী হইয়া" (পদ ৪৭)। কিন্তু বিদ্যাপতিতে "মাথুরের পালা" নাই। বাংলার বৈষ্ণবগণ মাথুরে যে ক্রন্দনের রোল তুলিয়াছেন বিদ্যাপতিতে তাহার অভাব। তিনি ইহার নামমাত্র উল্লেখ করিয়াছেন,—"হরি কি মথুরাপুর গেল ·····কৈনু ধাবই মাথুর মুখে॥ ·· বিদ্যাপতি কহ নীত, অব রোদন নহে সমুচিত।" এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, বিদ্যাপতির রাধার ক্রন্দনরোল তত তীব্র নয়, যত চণ্ডীদাসে। কিন্তু একটি পদে তিনি ভীষণ হা-হুতাশ প্রকাশ করিয়াছেন ;—"এখন তখন করি দিবস গোঙাইনু, দিবস দিবস করি মাসা" ইত্যাদি ; এতদ্দ্বারা একটী হতাশ-প্রেমিকের মনোবেদনা প্রকাশ পায়। এই পদেরই প্রতিধ্বনি করিয়া জ্ঞানদাসও[১৫] বলিয়াছেন,—"আজকালি করি দিবস গোঙাইতে জীবন ভেল অতি ভার,

* * * *

দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেল
বরিখে বরিখে কত ভেল।"

ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেশের পরাধীনতার কথা ভাবিয়া দুঃখ করিয়া কমলাকান্তের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন, "দিন গুনিতে গুনিতে মাস হয় ·····শতাব্দীও ঘুরিয়া ফিরিয়া সাতবার এল,

(১৩) "বিদ্যাপতি"—৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সম্পাদিত।
(১৪) "বিদ্যাপতি পদাবলী"—বসুমতী সংস্করণ।
(১৫) "বৈষ্ণব মহাজনপদাবলী"—৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৬ (বসুমতী সাহিত্যমন্দির)।

কিন্তু "মা আমার কই ?" ইত্যাদি। এই পদাবলীতে যেমন হতাশ-প্রেমিকের আক্ষেপ পাওয়া যায়, তেমনি দেশপ্রেমিকেরও আক্ষেপের অর্থ করা যাইতে পারে। আর বিদ্যাপতিতে দেখা যায় যে, ইনি পঞ্চগৌড়াধিপ শিবসিংহ ভূপের পারিষদ ছিলেন এবং এই রাজাকে তিনি "দিগ্বিজয়ী মহারাজাধিরাজ" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এই রাজা শেষে দিল্লীর বাদশাহের নিকট পরাজিত হইয়া বন্দী অবস্থায় তথায় নীত হন।* এই সময় হইতে নাকি তাঁহার গীত বন্ধ হইয়াছিল। বিদ্যাপতি হয় সামন্ত অথবা এক অর্দ্ধ-স্বাধীন রাজার পারিষদ ছিলেন এবং এই রাজার শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া অনুমান হয় যে, পরাধীনতার ছাপ হইতে তিনিও বিমুক্ত ছিলেন না। তাঁহার রাধা প্রথমেই যে আনন্দ ও ভোগের প্রতীকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, যাঁহার, দীনেশবাবুর কথায় "শরীরের ভাগ অধিক, হৃদয়ের ভাগ অল্প"[১৬]—তিনি শেষে বিরহের কালে যোগিনী সাজিতে চাহিয়াছিলেন। এইখানে দুইটি ভাবের সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বিরহিণী রাধাতে ভাবের আধিক্য বেশী। কিন্তু বিদ্যাপতির এই রাধা এত বেশী ক্রন্দন করেন নাই, যেমন চণ্ডীদাসের রাধা করিয়াছেন। ইহা কি উভয় প্রদেশের বিভিন্ন রাজনীতিক অবস্থা-জনিত মনস্তত্ত্ব-প্রসূত ? বিদ্যাপতিতে রাজা শিবসিংহের সংবাদ ব্যতীত আর কোন রাজনীতিক বা সামাজিক সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

বাংলায় চণ্ডীদাসের পরে বড় বৈষ্ণব কবি হইতেছেন জ্ঞানদাস। ইনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলায় আবির্ভূত হন[১৭]। জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্ত্রী জাহ্নবী দেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ইনি রাধাকৃষ্ণের

* আবার কেহ বা বলেন, ইনি নেপালে পলাইয়া যান। এই বিষয়ে Dr. Iswari Prosad 'The Modiaeval History of India' দ্রষ্টব্য।

(১৬) "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"—পৃঃ ২২২।

(১৭) "বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী"—ভূমিকা পৃঃ ৬।

প্রেমের সঙ্গে চৈতন্য নিত্যানন্দের প্রেম আনয়ন করিয়াছেন। যথা, "জ্ঞানদাস কহে গৌর কৃপাময়, হেরিতে কোন জীব দেহ ধরে।" আবার,—

"চৌদিকে নিতাই মোর হরিবোল বোলায়,
জ্ঞানদাস নিশি নিশি নিতাই গুণ গায়।"

জ্ঞানদাস যখন তাঁহার পদাবলী লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন চৈতন্য-প্রবর্তিত নব-বৈষ্ণবধর্ম্ম বাংলায় পূর্ণ জোয়ারের মুখে চলিতেছে।

এই সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা চৈতন্য ও নিত্যানন্দকে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়াছেন। যথা,—

"পূরবে গোবর্দ্ধন, ধবল অনুজ যায়
জগজনে কহে বলরাম
এবে সে চৈতন্য সঙ্গে, আইল কীর্ত্তন রঙ্গে
ধরি পহুঁ নিত্যানন্দ নাম।"

এই সম্প্রদায়ের কৃষ্ণ দশ অবতারের কৃষ্ণ নয়। ইঁহাদের কৃষ্ণ—

"কোটি ইন্দু জিনি বরন মনোহর
অধরে মুরলী রসাল।"

জ্ঞানদাসের ষোড়শ গোপালের অনেকে রঙিন পাগড়ী বা বিনোদ পাগড়ী মস্তকে ধারণ করেন। শ্রীরাধিকার কপালে সিন্দূর বিরাজ করিতেছে: "সুরঙ্গ সিন্দূর ভালে অতি অনুপম"। জ্ঞানদাসের রাধা অভিসারে গমন করিতেছেন—"নীল বসনে তনু ঝাঁপল গোরী, চলিল নিকুঞ্জে শ্যামরসে ভরি।"

তৎপরে শ্রীকৃষ্ণের প্রবাস যাত্রাকালে শ্রীরাধা দুঃখ করিয়া বলিতেছেন:—

মুড়াব মাথার কেশ ধরিব যোগিনী বেশ
যদি সই পিয়া নাহি আইল

* * * *

গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব
শঙ্খের কুণ্ডল পরি।
যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে
যথায় নিঠুর হরি॥"

পরে মাথুরের বিচ্ছেদে শ্রীরাধার ক্রন্দনের রোল যখন চরমে উঠিয়াছে তখন তিনি বলিতেছেন:

"মাধব কৈছন বচন তোমার আজি কালি করি দিবস গোঙাইতে
জীবন ভেল অতি ভার॥
দিবস দিবস করি মাস বরিখ গেল
বরিখে বরিখ কত ভেল॥"

জ্ঞানদাসে শ্রীকৃষ্ণের নাগর বেশ ও তাঁহার প্রেম লীলার বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়; আর পাওয়া যায় রাধার বিরহে যোগিনীর বেশ গ্রহণ করার কথা, এবং মাথুরে বিদ্যাপতির কথারই প্রতিধ্বনি পাই। বিরহিণী রাধা দিন গণিতেছেন শ্রীকৃষ্ণের আশা পথ চাহিয়া। চণ্ডীদাসের সময় হইতে যে প্রেম ও বিরহের স্রোত বৈষ্ণবসাহিত্যে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে, জ্ঞানদাসে তাহাই পাওয়া যায়।

ইহার পর আসেন গোবিন্দদাস। ইনি বলরামদাসের একজন বন্ধু এবং চৈতন্যের পারিষদের শিষ্যবর্গের একজন। ইনি প্রার্থনাতে বলিতেছেন:

"ব্রজেন্দ্র নন্দন যেই শচীসুত হইল সেই
বলরাম হইল নিতাই"

দীনেশবাবু বলেন, গোবিন্দদাসের আদর্শ ছিলেন বিদ্যাপতি[১৮]। ইনি বন্দনাতে গাহিতেছেন: "জয় শচীনন্দন ত্রিভুবনবন্দন।" ইহার শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন, "চিকনকালা, গলায় মালা, বাজয় নুপুর পায়।" ইঁহার রাধা বিরহের কালে কাঁদিয়া বলিতেছেন,—

(১৮) "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—পৃঃ ২৮৮।

"মো যদি জানিতাঙ পিয়া যাবেরে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাঙ বান্ধিয়া॥"

গোবিন্দদাসের শেষের পদাবলীগুলি গৌরলীলা বিষয়ক। চৈতন্য প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, তাঁহার তিরোভাবের পরই শ্রীকৃষ্ণকে বিদায় দিয়া তাঁহাকে বসান হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার অনুকরণেই গৌরাঙ্গ ভক্তি পদাবলী লিখিত হইয়াছে। গোবিন্দদাস গাহিয়াছেন ঃ

"নাচে গোরা প্রেমে ভোরা, ঘন ঘন বলে হরি।"
খেনে বৃন্দাবন কররে শ্রবণ, খেনে খেনে প্রাণেশ্বরি।"

গোবিন্দদাসে কোন সামাজিক সংবাদ পাওয়া যায় না।

এইবার গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের খাস সাহিত্য মধ্যে সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নবদ্বীপের এই ব্রাহ্মণ যুবক দ্বারা যে ভাবতরঙ্গ উত্থিত করা হয়, তাহা বাংলায় এক ঘোর বিপ্লব সাধন করে এবং বাংলার বাহিরেও সে ধাক্কা গিয়া পৌছায়। এইজন্য তাঁহার জন্ম-সময়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিষয়ে কিছু অবগত হওয়া প্রয়োজন। বাংলায় তখন পূর্ণভাবে মুসলমান শাসন চলিতেছে। এই যুগে একদিকে যেমন বাঙ্গালী নানা কারণবশতঃ বহু সংখ্যক মুসলমান হইয়াছে, তেমনি বাঙ্গালীও গৌড়ের সিংহাসন দখল করিয়া স্বাধীনতার পতাকাও উড্ডীন করিয়াছে। চৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বে রাজা গণেশ ও তৎপুত্র যদু গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। আবার এই সময়েই দনুজমর্দ্দন দেব ও তৎপুত্র মহেন্দ্রের নামে টাকা বাংলায় প্রচলিত হয়। ইহা তাঁহাদের স্বাধীনতা ঘোষণার চিহ্ন বলিয়া ইতিহাসে স্বীকৃত হয়। ঐতিহাসিক ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যে, যখন সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত তুর্কীর পদানত, তখন একমাত্র বাংলাই স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে[১১]। মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসের চিত্রপটে

(১১) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "বাংলার ইতিহাস।"

এই ঘটনা ক্ষুদ্র নহে[২০]। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন, যত মুসলমান হইয়া বাংলায় নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করেন ও হিন্দুদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। ইহার ফলে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদেশে চলিয়া যান। তৎপর গৌড়ের সিংহাসন লইয়া একদিকে যেমন কাটাকাটি আরম্ভ হয়, তেমনি অন্যদিকে জয়ানন্দের 'চৈতন্য মঙ্গলে' পাওয়া যায় যে, চৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বে গৌড়ের সম্রাট্ নবদ্বীপ উৎসন্ন দিবার হুকুম দেন,

"আচম্বিতে নবদ্বীপে হইল রাজভয়
ব্রাহ্মণ ধরিঞা রাজা জাতিপ্রাণ লয়॥"[২১]

জয়ানন্দ বলেন যে, লোকে বাদশাহের কাণে গিয়া লাগায় যে, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণেরা তাঁহার রাজত্ব কাড়িয়া লইতে চাহেন। ইহাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, নবদ্বীপে হিন্দু রাজা হইবে এবং ইহারা সর্ব "ধনুর্ময় প্রজা"।* অতএব তিনি যেন সাবধান হন। ইহারই ফলে রাজাজ্ঞায় নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ-ধ্বংসের আদেশ হয়। কিন্তু কোন মুসলমান লিখিত ইতিহাসে ইহার উল্লেখ নাই; অথচ দেখা যায় যে, ব্রাহ্মণ রাজা হইবার প্রবাদ দুইখানি বৈষ্ণবগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। অন্যদিকে ইহাও দৃষ্ট হয় যে, ফার্সীভাষায় লিখিত ইতিহাসে এই সব অনেক খবর নাই। এইরূপ ঘটনা সেযুগে প্রায়ই ঘটিত। সুতরাং এইসব ইতিহাসে, যাহাতে কেবল "রাজা জন্মাল, ফুলিল ও মরিল" কাহিনীই লিপিবদ্ধ, তাহাতে এই সংবাদ স্থান

(২০) জয়চন্দ্র নারং—"ইতিহাস প্রবেশ" (হিন্দী)।

(২১) জয়ানন্দ—"চৈতন্যমঙ্গল"—নদীয়া কাণ্ড পৃঃ ১১।

* চৈতন্যভাগবতে এই ভবিষ্যৎ-বাণীর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়; "কেহ বোলে, বিপ্র রাজা হইবেক গৌড়ে। সেই এই বুঝি, এই কথন না নড়ে।" আ ১২।২৬৯। জয়ানন্দ ও চৈতন্যভাগবতের কথায় স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণরাজত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে হিন্দুরা বুক বাঁধিয়া বসিয়াছিলেন।

না পাওয়া মোটেই আশ্চর্য্য নয়। অন্যপক্ষে বর্ত্তমানকালের হিন্দু লেখকেরা জয়ানন্দের এই সংবাদের উপর আস্থা স্থাপন করিয়াছেন। ৺ নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিয়াছেন,

"গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছে।
নিশ্চিন্ত না থাকহ প্রমাদ হব পাছে॥"

উদ্ধৃত বচনটি কিছু অতিরঞ্জিত হইলেও, উহা যে একটি অতীত ষড়যন্ত্রের দূর প্রতিধ্বনি, তাহাতে সন্দেহ নাই[২২]।

রজনী চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিয়াছেন, এই ঘটনাটি হোসেন সা'র পূর্ব্বে হাবসী বাদশাহদের সময়ে সংঘটিত হয়[২৩]। এই সংবাদটি অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু পাওয়া যায় না। হিন্দুরাজত্ব হস্তচ্যুত দেখিয়া আবার জনকতক হিন্দু মনীষী যে তার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন নাই, তাহাই বা কি প্রকারে বলা যায়? বিশেষতঃ এই সময়কার একজন খ্যাতনামা লোক ছিলেন অদ্বৈতাচার্য্য, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ রাজা গণেশের মন্ত্রণাদাতা ছিলেন। অদ্বৈত প্রকাশে বর্ণিত আছে,—

"সেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাতি।
*   *   *   *
যাহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা" (২৪)।

এই রাজনীতিক ও সামাজিক চিত্রপট পশ্চাতে রাখিয়া শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বৈদিক-ব্রাহ্মণবংশীয় এবং শ্রীহট্ট হইতে আগমন করেন। এক্ষণে তর্ক উঠিয়াছে যে, চৈতন্যের মাতা শচীদেবী কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণকন্যা, অর্থাৎ বৈদিক ব্রাহ্মণদের মধ্যে পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য—এই দুই শ্রেণী আছে। শ্রীহট্টের ব্রাহ্মণের মুখে লেখক শুনিয়াছেন যে, তথাকার "সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণশ্রেণী" চৈতন্যকে নিজেদের

(২২) "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস"—ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃঃ ৭১।
(২৩) "গৌড়ের ইতিহাস" দ্রষ্টব্য।
(২৪) ঈশান নাগর কৃত "অদ্বৈত প্রকাশ।"

জাতির লোক বলিয়া দাবী করেন। অন্যপক্ষে জয়ানন্দ বলিতেছেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ উড়িষ্যা হইতে আসিয়াছেন ঃ—

'শ্রীহট দেশে পালাইয়া গেল।
রাজা ভ্রমরের ডরে"। (২৫)

কিন্তু আর কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে এই কথার উল্লেখ নাই। এইখানে জ্ঞাতব্য যে, পাশ্চাত্য বৈদিকগণ নিজেদের পশ্চিমাগত বলেন; দাক্ষিণাত্যেরা উড়িষ্যাগত বলেন এবং "সাম্প্রদায়িকেরা" নিজেদের মিথিলাগত বলেন। চৈতন্যদেব যদি পাশ্চাত্য বা সাম্প্রদায়িক শ্রেণী-সম্ভূত হন, তাহা হইলে তাঁহার বংশ উড়িষ্যা হইতে কেমন করিয়া আসিতে পারে? আর যদি শেষোক্ত কথাই সত্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্বে একই জাতির বিভিন্নশ্রেণীর মধ্যে বিবাহে এত বিধি-নিষেধের কড়াকাড়ি ছিল না।

তৎপরে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, চৈতন্যের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্বে নবদ্বীপের মনীষীরা বাংলাকে তুর্কী-মুসলমানদের হাত হইতে উদ্ধার করিবার জল্পনা-কল্পনা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, কোন কোন মনীষী হিন্দুর এই অবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। পক্ষান্তরে, বিদেশীর হাত হইতে বাঁচিবার জন্য ব্রাহ্মণগণ নিজেদের কঠোর কূর্ম্মাবস্থায় আনয়ন করিয়াছিলেন[২৬]। এই সময়ে উত্তর-বঙ্গে কামরূপের হিন্দু-রাজত্ব মুসলমানেরা জয় করিয়াছিলেন,—

"বঙ্গদেশে কামরূপ রাজা অতি শুদ্ধ।
পাঠানে লইল তাহা করি মহাযুদ্ধ॥" *

(২৫) "চৈতন্য মঙ্গল" পৃঃ ৯৬।

(২৬) পদ্মপুরাণ দাড়িওয়ালা অশ্বারোহী তুরঙ্কের সহিত সর্ব্বপ্রকারের সম্পর্ক বর্জ্জন করিতে বলিয়াছেন এবং ইহাতে দুঃখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ঘোর কলি যুগে অনেকে ইহাদের সংস্রবে আসে।

* প্রেমবিলাস—পৃঃ ১৮৯। বোধহয় হোসেন সাহ কর্ত্তৃক উত্তর বঙ্গের কামতাপুর রাজত্ব জয়ের কথা এই স্থলে ইঙ্গিত বা সূচিত হইয়াছে।

এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, কামরূপ তখন বাংলার অন্তর্গত ছিল। এই প্রকারের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রীচৈতন্যের জীবনীতে গোটাকতক বড় বড় সমাজ-তাত্ত্বিক সংবাদ পাওয়া যায়। (১) তিনি তরুণ বয়সে নিজেই টোল খুলিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। (২) তৎকালে নবদ্বীপের টোলে বৈদ্যজাতীয় মুরারি গুপ্তকেও পড়িতে দেখা যায়।

কায়স্থ বা অন্যজাতির লোককে টোলের ছাত্ররূপে উল্লিখিত হইতে দেখা যায় না; অথচ চৈতন্যচরিতামৃতে বৈদ্যবংশীয় চন্দ্রশেখর দাসকে "শূদ্র" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে,—

"কাশীতে লেখক শূদ্র শ্রীচন্দ্রশেখর।
তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥" (২৭)

আবার লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে দেখা যায় যে, শচী ও জগন্নাথ মুরারিকে বলিতেছেন—

"তোরে বলি শূদ্র মুনি
সর্ব্বলোকে ব্যাখ্যানি॥" (২৮)

(৩) এইযুগে ব্রাহ্মণ-শিশু জন্মগ্রহণ করিলে, মাসান্তে নিষ্ক্রামণ-সংস্কার হইত—"পরিপূর্ণ হইল মাসেক এই মতে।" আবার শিশুর মাতা গীত-বাদ্যের সহিত গঙ্গাস্নান করিয়া ষষ্ঠীর স্থানে যাইতেন এবং খই, কলা, তৈল,

(২৭) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—আদিলীলা, ৭ম পরিচ্ছেদ।

(২৮) লোচন দাস—"চৈতন্যমঙ্গল" পৃঃ ৫০; নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে

সিন্দুর, গুয়া, পান সকলকে সম্মানার্থ দিতেন (২৯)। এই স্থানে ইহাও পাওয়া যায় যে, বালকের ব্যায়রাম হইলে "ষষ্ঠীর খেলা" বলিয়া তাহাকে নিমগাছের উপর রাখা হইত।৩০ এই কুসংস্কার বা অনুষ্ঠান আজ আর বাংলাদেশে দেখা যায় না। আবার, শিশুকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য 'বিষ্ণু-রক্ষা' ও 'দেবী-রক্ষা' পড়া হইত এবং ঘরের চারিদিকে মন্ত্র পড়া হইত (৩১)।

(৪) তখন পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা পূর্ব্ববঙ্গীয় লোকদের ভাষা লইয়া ঠাট্টা করিত (চৈঃ, ভাঃ — আদি) এবং তাঁহাদের "বাঙ্গাল" বলা হইত (৩২)। আবার ইহাও পাওয়া যায় যে, পূর্ব্ববঙ্গকে বলা হইত— "পাণ্ডব-বর্জ্জিত দেশ—সর্ব্বলোকে গায়। গঙ্গা হঞা গঙ্গা নহে — এই সাক্ষী তার।"৩৩

(৫) দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মীরীর নবদ্বীপে পরাজয়ের গল্পে এবং মাধবপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরীর নবদ্বীপে জগন্নাথ মিশ্রের বাড়ীতে—'অপূর্ব্ব মোচার ঘণ্ট তাহা যে খাইল' ৩৪ সংবাদে এই তথ্য অবগত হওয়া যায় যে ভারতের পণ্ডিতদের মধ্যে intellectual isolation অর্থাৎ ভাব বিনিময়ের আদান-প্রদানের অভাব ছিল না।

লেখক শুনিয়াছেন যে তথায় বৈদ্যেরা এখনও শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হন। সেইযুগের বল্লাল-চরিতেও তদ্রূপ উল্লেখ হইয়াছে।

(২৯) চৈঃ, ভাঃ, আদি—৪।১৭-২১।

(৩০) চৈঃ, ভাঃ, আদি—পৃঃ ৩৫-৩৬।

(৩১) চৈঃ, ভাঃ—আদি, ৪।৭।

(৩২) চৈঃ, ভাঃ, আদি, ১৫।২৭।

(৩৩) " " পৃঃ ৭৪।

(৩৪) চৈতন্যচরিতামৃত,—মধ্যলীলা, ৯ম পরিচ্ছেদ ; চৈ, ভা,—আদি ৮৩-১১৭॥

(৬) চৈতন্যের বিবাহের খরচের তালিকা দেখিয়া অনুমান হয় যে, তখনকার দিনের খুব ঘটার বিবাহেও খরচ বেশী হইত না। সেকালে বিবাহের সময়ে "পাণী সাহিবারে" প্রথা ছিল—"চলিলা নাগরী সবে পাণী সাহিবারে"।[৩৫] সেই সময়ে মালাচন্দন দিয়া বরযাত্রীদের সন্তুষ্ট করা হইত; আজকালকার মত নিমন্ত্রণ খাওয়াইবার আড়ম্বর ছিল না। তবে বর দোলায় চড়িয়া বিবাহার্থ যাইত। বিবাহে 'নৃত্য-গীতবাদ্য-কোলাহল' হইত।

(৭) ঈশ্বরপুরী ও মাধবেন্দ্র পুরীর অস্তিত্বে ও অন্যান্য ন্যাসী সন্ন্যাসীর উল্লেখে[৩৬] বুঝা যায় যে, তৎকালে অনেক বাঙ্গালীও দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী হইতেন। চৈতন্যের সন্ন্যাসগ্রহণকালে কাটোয়াতে মাথার চুল কাটা হইতে বুঝা যায় যে, তৎকালে অনেকে লম্বা চুলও রাখিতেন[৩৭]।

(৮) সন্ন্যাসগ্রহণের পর যখন চৈতন্যদেব শান্তিপুরে যান, তখন অদ্বৈতের বাড়ীতে সকলের খাওয়ার সময়ে "হরিদাস ঠাকুরে আগু হবিষ্যান্ন দিল" (৩৮)। তেমনি অদ্বৈত একবার তাঁহাকে খাওয়াইবার সময়ে বলিয়াছিলেন, "তোমারে খাওয়াইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণভোজন।" আর একবার তিনি হরিদাসকে শ্রাদ্ধান্ন খাওয়াইয়াছিলেন—"আচার্য্য গোঁসাঞি যাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র" (৩৯); অথচ সকলেই জানিতেন যে, তিনি পূর্ব্বে মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন,—"হীন

(৩৫) লোচনদাস—"চৈতন্যমঙ্গল", পৃঃ ৬৫।

(৩৬) চৈ, ভা—অন্ত্য ৪।৬৭।

(৩৭) মস্তকে লম্বা কেশ রাখা ভারতের একটি প্রাচীন প্রথা। মেগাস্থিনিস্ একথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

(৩৮) জয়ানন্দ—"চৈতন্যমঙ্গল"—পৃঃ ৯৪।

(৩৯) চৈ, চ, আদি, ১০ম পরিচ্ছেদ।

জাতিতে জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর"[৪০]। আবার মুলুকের পতি তাঁহাকে বলিয়াছেন,—

"জাতিধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।
পরলোকে কেমনে বা পাইবে নিস্তার॥" ৪১

(৯) তাঁহার সন্ন্যাস-সময়ে পশ্চিমদেশ ভ্রমণকালে ভাবাবেশে অজ্ঞানাবস্থায় মাঠে পতিত দেখিয়া একজন সম্ভ্রান্ত পাঠান তাঁহার লোক-জনকে বাঁধিয়াছিল। তিনি পরে বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ করেন, এবং পরে তাঁহার রামদাস নাম হয়। এই সঙ্গে বিজুলী খাঁ[৪২] নামে জনৈক পাঠান রাজকুমারের নাম উল্লেখ আছে। ইনিও পরে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া 'পাঠান বৈষ্ণব' বলিয়া খ্যাত হন।

(১০) এই সময়ে বাঙ্গালীদের "গৌড়ীয়া" বলা হইত—"এক গৌড়ীয়া কান্থা ধুঞা দিয়াছে শুকাইতে"[৪৩]। কিন্তু গোবিন্দদাসের কড়চায়[৪৪] দেখা যায় যে, দুইজন "বাঙ্গালী" তীর্থযাত্রীর সঙ্গে চৈতন্যদেবের গুজরাটে সাক্ষাৎ-কার হয়। এতদ্দারা বুঝা যায় যে, বঙ্গবাসীর "বাঙ্গালী" নামটাও প্রাচীন।

(১১) বৈষ্ণবেরা খোলকে আগে 'মাদল' বলিতেন,—

"মাদল বাজায় যত বৈষ্ণবের দল
চৌদ্দ মাদল বাজে উচ্চ সংকীর্ত্তন॥ (৪৫)

---

(৪০) চৈ, চ, অ, ১১শ পরিচ্ছেদ।

(৪১) চৈ, ভা, আ, ১৬, ৭৩।

(৪২) "চৈতন্যচরিতামৃত', পৃঃ ১৯৩-১৯৪, পৃঃ ৯৪; কবিরের এক শিষ্যের নাম বিজলি খাঁ। ইনি কবীরের সমাধির উপর যে প্রস্তরফলক স্থাপিত করিয়াছিলেন, অযোধ্যা জেলার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ তাহা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই এক নামধারী উভয় একব্যক্তি কিনা, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান প্রয়োজন।

(৪৩) চৈ, চ মধ্য ২০ প।

(৪৪) গোবিন্দদাসের কড়চা—পৃঃ ৬৩।

(৪৫) গোবিন্দদাসের কড়চা—পৃঃ ৮৪; চৈ, চ অ, ৭ পরিচ্ছেদ।

(১২) চৈতন্যদেব একদিন জগন্নাথের মন্দিরের সিংহদ্বারে বসিয়া নিম্নলিখিত কথা বলিয়াছিলেন,—

"বৈষ্ণবের জাতিভেদ করিলে প্রমাদে।
বৈষ্ণবের জাতিভেদ নাহিক সংসারে॥" (৪৬)

কিন্তু মহাপ্রভু যখন কলির আচার বর্ণনা করেন, তখন তাঁহাকে সনাতনপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া মনে হয়ঃ—

"শূদ্র সব ছাড়ি দেবে ব্রাহ্মণের সেবা
বিধবা ব্রাহ্মণী সব খাইবে আমিষা।
শূদ্র সব করিবেক পুরাণ বাখান
চণ্ডালিনী শূদ্র করিবেক একাদশী।
ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে
মোজা পাত্র লভি হাতে কামান ধরিবে" (৪৭)

(১৩) জয়ানন্দ বলেন, প্রতাপরুদ্র গৌড় জয় করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন,—

"চৈতন্যদেবে রাজা আজ্ঞা মাগিল।
প্রভু বলেন প্রতাপরুদ্র কুবুদ্ধি লাগিল।
কাঞ্চী দেশ জিনি কর নানা রাজ্য।
গৌড় জিনিব হেন না দেখিব সে কার্য॥"

অবশেষে চৈতন্যদেবের পরামর্শে প্রতাপরুদ্র বিজয়নগরে যুদ্ধ করিতে গেলেন।[৪৮]

(১৪) এই যুগেও বাঙ্গালীরা যে সাহসী ছিল না তাহার প্রমাণ বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাওয়া যায়। যখন বৃন্দাবনে বৈষ্ণব নেতারা সমস্ত হস্তলিখিত

---

(৪৬) জয়ানন্দ চৈতন্য মঙ্গল —পৃঃ ১০৬।
(৪৭) " " —পৃঃ ১৩৯।
(৪৮) " " —পৃঃ ৪৯০।

পুঁথি বাংলায় পাঠাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন তখন শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত কয়েকজন রাজপুত রক্ষী পাঠাইয়াছিলেন, কারণ রাস্তা দুর্গম আর বাঙ্গালী সঙ্গে দিলে কাজ চলিবে না, যেহেতু—

"তবে সে পাঠান পঞ্চজনেরে বাঁধিলা
কাটিতে চাহে গৌড়িয়া সব কাঁপিতে লাগিলা ॥ (৪৯)

(১৫) বৈষ্ণবসাহিত্যে দুই একবার বৌদ্ধদের উল্লেখ পাওয়া যায়।[৫০] চৈতন্য কয়েকজন বৌদ্ধকে নিজের মতে আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া বলা হয়। ইহা প্রতীত হয় যে, তখনকার ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বৌদ্ধদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেন না, যথা—"যদ্যপি অসম্ভাষ্য বৌদ্ধ অযুক্ত দেখিতে. তথাপি মিলিল প্রভু তাদের উদ্ধারিতে"। (চৈঃ চঃ)

(১৬) পশ্চিমের লোকদের তখনকার বাঙ্গালীরাও 'মেড়ো' নামে অভিহিত করিতেন :—"এই স্থানে ছিল এক মাড়ুয়া ব্রাহ্মণ।"[৫১]

(১৭) চৈতন্যদেবের মুসলমান শিষ্য ছিল। ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের জাতি নিয়া নানা বিতর্ক আছে। মুরারি গুপ্তের কড়চাতে উল্লিখিত—"তেন জাতোঽসৌ যবনে কুলে"। গুপ্ত ইহাকে যবনকুলে জাত বলিয়াছেন।[৫২]

(১৮) চৈতন্যদেবের বাংলার বাহিরে ভ্রমণ একটা missionary activity হইয়াছিল। বহুকাল পরে একজন বাঙ্গালী ধর্ম্মপ্রচারক নিজের দেশের বাহিরে গিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়া আসেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এই ধর্ম্মপ্রচারকার্য্য এখনও বন্ধ হয় নাই; তাহা এখনও শনৈঃ শনৈঃ ও অজ্ঞাতসারে চলিতেছে।

---

(৪৯) চৈ, চ, মধ্য, ১৮শ পরিচ্ছেদ।

(৫০) " " মধ্য খণ্ড, ৩।১০৯।

(৫১) গোবিন্দদাসের কড়চা—পৃঃ ৮২।

(৫২) মুরারি গুপ্তের কড়চা, ৪র্থ সর্গঃ ১১ শ্লোক।

(১৯) চৈতন্যদেব যে ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম্ম হইতে একটা পৃথক্ সম্প্রদায় গঠন করিতেছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায় যখন তাঁহার অনুমতিতে তাঁহার শিষ্যেরা—গোপাল ভট্ট ও সনাতন গোস্বামী, বৈষ্ণব সমাজকে পরিচালিত করিবার জন্য "হরিভক্তিবিলাস" নামে একটী বিধি-ব্যবস্থার পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের স্মৃতিগ্রন্থ। আবার তাঁহার সম্প্রদায়কে 'নিমানন্দী সম্প্রদায়' বলা হইত।[৫৩]

(২০) চৈতন্য সন্ন্যাসিবর একবার গৌড় সহরে গিয়াছিলেন তাঁহার জনপ্রিয়তা দেখিয়া বাদ্‌সাহ হোসেনসাহ পারিষদদের হুকুম দেন যেন এই বাউল সন্ন্যাসীকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হয়, কিন্তু রাত্রিতে রূপ-সনাতন ও কেশব ছত্রনাজ লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে গৌড়ত্যাগ করিতে পরামর্শ দেয়, কারণ বাদসাহের খেয়ালে বিশ্বাস নাই।

(২১) অন্যান্য প্রদেশে, সেই সময়কার ধর্ম্মসংস্কারকদের কাহার কাহারও সঙ্গে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভব নয়।[৫৪]

(২২) চৈতন্যের প্রচারকার্য্য যে সনাতন প্রথার বিরুদ্ধ ছিল, তাহা এই শ্লোকেই প্রমাণিত হয়, "সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্ব নাশ। নীচ শূদ্র দ্বারে করে ধর্ম্মের প্রকাশ।"[৫৫]

(২৩) চৈতন্যের তিরোভাবের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক গল্প আছে। কিন্তু জয়ানন্দ বলিতেছেন—

"আষাঢ় বঞ্চিত রথ বিজয়া নাচিতে
ইটাল বাজিল বাম পাত্র আচম্বিতে।"

(৫৩) অনুরাগবল্লী—৮ম মঞ্জরী, পৃঃ ১১৩

(৫৪) এই বিষয়ে ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদারের "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান" দ্রষ্টব্য।

(৫৫) চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্যলীলা, ৫ম পরিচ্ছেদ।

চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।
সেই লক্ষে টোটায় শয়ন অবশেষে।
*   *   *
মায়া শরীর তথায় রহিলা যে পড়ি
চৈতন্য গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি।" (৫৬)

জয়ানন্দের পুস্তকের এই সংবাদ সম্পর্কে নানা সমালোচনা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা অলৌকিকত্বে বিশ্বাস করেন না তাঁহারা এই গল্পকে যৌক্তিক ও স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করিবেন।

(২৪) বাঙ্গলাদেশে 'কয়া' নামে এক প্রকারের জলক্রীড়া ছিল— "গৌড়দেশে জলকেলি আছে 'কয়া' নামে" [৫৭]।

(২৫) চৈতন্যের জন্মের সময়ে ছুৎমার্গ বিশেষ প্রবল ছিল। ব্রাহ্মণদের মধ্যে ইহা অতি প্রবল ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। বালক নিমাই একবার বিপ্র-অতিথির প্রসাদ খাওয়ায়, নারীরা তাঁহাকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আয় নিমাই চাঙ্গাতি! কি করিবা, এবে যে তোমার গেল জাতি? কোথাকার ব্রাহ্মণ, কোন্ কুল, কেবা চিনে? তার ভাত খাই জাতি রাখিবা কেমনে?" (চৈতন্য ভাগবত, আদি, ৫।৫৫-৫৬)

নিত্যানন্দের কর্ম্ম

চৈতন্যের তিরোভাবের পর নিত্যানন্দ অবধূতকে বৈষ্ণবসমাজে নেতা বলিয়া গণ্য করা হয়। ইনি রাঢ়ীব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন। কথিত আছে, পুরীতে নিত্যানন্দের সঙ্গে চৈতন্যের বাংলায় প্রচারকার্য্য সম্বন্ধে নিভৃতে কয়েক দিন আলোচনা হয়[৫৮]। ইহার ফলে, তিনি বাংলায় প্রেরিত হন।

(৫৬) জয়ানন্দ, পৃঃ ১৫০-১৫৫।
(৫৭) চৈতন্য ভাগবত—অন্ত্য ৮।১১৬।
(৫৮) চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা, ১৫ পরিচ্ছেদ; ভক্তি রত্নাকর—পৃঃ৫৩৭

৪০৭৫/৩/, ২২/৪/১৩৬৬

তিনি বাংলায় আসিয়া সূর্য্য সারখেলের কন্যা বসুধাদেবীকে বিবাহ করেন। উপবীত-ত্যাগী ব্রাহ্মণকে বিবাহ দিতে আপত্তি ছিল; যাহা হউক, তবু বিবাহ হয়। বিবাহের পর নিত্যানন্দকে একদিন শ্বশুর বাড়ীতে খাইবার সময়ে তাঁহার শ্যালিকা জাহ্নবীদেবী পরিবেশন করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে জাহ্নবীদেবীর অবগুণ্ঠন খুলিয়া যায়। তাহাতে তিনি তার হাত ধরিয়া ডানদিকে তাহাকে বসাইলেন এবং শ্বশুরকে বলিলেন,—"এই মেয়েটীও তোমার নিলুম"[৫৯]।

নিত্যানন্দের বিবাহ বিষয়ে অনেক বিতর্ক আছে[৬০]। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার আরও একটী স্ত্রী ছিল। নিত্যানন্দের সর্ব্ব কর্ম্মই ব্রাহ্মণদের আচারের প্রতিকূল ছিল। অবধূত হইয়া সংসারে পুনঃ প্রবেশ করায়, তাহার "বান্তাসী" দোষ হইয়াছিল। তিনি জাতিগত স্পর্শদোষ মানিতেন না। তিনি সকলের বাড়ীতেই খাইতেন—"হেন জাতি না থাইল যার ঘরে"[৬১]। চৈতন্যদেব সন্ন্যাসী হইয়াও, ব্রাহ্মণের আচার রক্ষা করিয়া চলিতেন বলিয়া কথিত আছে। প্রথমতঃ তাঁহার হাতে একটি দণ্ড থাকিত। এই দণ্ড তাঁহার উড়িষ্যাগমনকালে রাস্তায় নিত্যানন্দ ভাঙ্গিয়া দেন। এই দণ্ডটি কি? ইহা কি সাধারণ লাঠি, না, দশনামী দণ্ডীস্বামীদের দণ্ড? শেষোক্তটি দণ্ডীদের ব্রাহ্মণবংশে উৎপন্ন বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, শঙ্করাচার্য্য এই রীতি প্রবর্ত্তন করেন নাই। ইহা দণ্ডীদের ব্রাহ্মণাভিমানের প্রতীক। চৈতন্যের দণ্ড যদি দণ্ডীদের ন্যায় হয়, তাহা হইলে নিত্যানন্দের দ্বারা ইহা ভাঙ্গিবার একটা বিশেষ অর্থ আছে। মনে হয় তিনি চৈতন্যের ব্রাহ্মণ-বংশের শেষ চিহ্নটুকু মুছিয়া দিতে

(৫৯) নিত্যানন্দ দাস—"প্রেমবিলাস।"
(৬০) লালমোহন বিদ্যানিধি—"সম্বন্ধ নির্ণয়।"
(৬১) চৈতন্য ভাগবত—মধ্য ২৪।৮২।

চাহিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ সর্ব্ববিষয়ে সংস্কারক ছিলেন। যখন ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সঙ্গে উদ্ধারণ দত্তকে দেখিয়া বলিলেন—"এই লোকটী কে? ইঁহার পূর্ব্বাশ্রমের কি নাম ছিল?"—তখন নিত্যানন্দ উদ্ধারণের পরিচয় দিয়া বলেন, "ইনি কখনও রাঁধেন, আমি কখনও রাঁধি, এবং উভয়ে খাই।" তাঁহার একমাত্র কন্যা গঙ্গার সহিত বারেন্দ্র কুলজাত ব্রাহ্মণের বিবাহ হয়[৬২]। তাঁহার আর একটী বড় কার্য্য হইতেছে খড়দহে কয়েক শত "ন্যাড়া-নেড়ীদের" বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করা। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার পুত্র বীরচন্দ্রই এই দীক্ষা দেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসারে ইহারা বৌদ্ধ সহজযান সম্প্রদায়ভুক্ত ন্যাড়াচার্য্যের দল। যখন মুসলমানেরা বাংলার জনসাধারণকে স্বীয় দলে স্রোতের ন্যায় টানিয়া লইতেছিল, আর অপর দিকে ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ্যবাদীয় ধর্ম্মের বহির্ভূত লোকদের অভিশপ্ত করিয়া সামাজিক নিপীড়ন করিতেছিল, তখন সকল প্রকার রাজশক্তির সহায়তা হইতে বঞ্চিত বৌদ্ধ, নাথপন্থী[৬৩] প্রভৃতি সম্প্রদায়গণ হয় মুসলমান, না হয় নব-সংস্থাপিত নব-বৈষ্ণবধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। উপরোক্ত ঘটনাটি তাহারই একটী পরিচয়। নিত্যানন্দের সহিত চৈতন্যের কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা কেহই জানেন না। কিন্তু ফলস্বরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, নিত্যানন্দ এই নব-প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবসম্প্রদায়, যাহাতে তৎকালে[৬৪] ব্রাহ্মণের

(৬২) নিত্যানন্দ দাস—"প্রেম বিলাস", পৃঃ ২৪৯।

(৬৩) লামা তারানাথ তাঁহার "বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাস" (Schiefner কর্ত্তৃক ভাষান্তরিত) পুস্তকে বলিয়াছেন যে গোরক্ষনাথের দল বাঙ্গলায় তুরস্ক-আক্রমণের পর "ঈশ্বর-পূজক" তীর্থিকদের সঙ্গে মিশিতে আরম্ভ করে, কারণ তাঁহারা বলেন এতদ্দ্বারা তাহারা তুরস্কাক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে পারেন। বোধ হয় নাথ-যোগী সম্প্রদায়ের যে-সব লোক আজ হিন্দু বলিয়া নিজেদের পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তাঁহারা সেই সময় হইতে হিন্দুসমাজের এক কোণে স্থান পান, যদিচ এই স্থান একেবারেই সুখের নয়।

(৬৪) "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান," পৃঃ ৬০৯।

ভাগ অতি বেশী, বৈদ্য তাহার নীচে এবং কায়স্থের সংখ্যা অতি মুষ্টিমেয়— তাহার দ্বার সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করিলেন। এই দ্বার এখনও রুদ্ধ হয় নাই। যেখানে ব্রাহ্মণেরা যান না বা যাইতে চান না, বৈষ্ণব প্রচারকেরা তথায় আজও যাইতেছেন। ইহার ফলে, বাংলার বেশীরভাগ হিন্দু আজ বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী। রাজা রামমোহন রায়, শিশিরকুমার ঘোষ ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, বেশীর ভাগ কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য শাক্ত এবং অন্যান্য জাতিগুলি বেশীরভাগ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত[৬৫]। এই ব্যাপারে class-character বেশ পরিষ্কার বুঝা যায়। পাল ও সেন বংশের দরবারী শ্রেণীর লোকেরা অর্থাৎ অভিজাতেরা হয় মহাযানপন্থী বৌদ্ধ, নয় তান্ত্রিক ছিলেন। তাঁহাদের বংশধরদের অনেকেই শাক্ত হইয়া রহিলেন। আর সহজযানী, হীনযানী, নাথপন্থী লোকেরা যাঁহারা মুসলমান হইলেন না, সেই সব গণশ্রেণীর লোকেরা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। লেখক একবার তাঁহার জনৈক পশ্চিমবঙ্গীয় মুসলমান বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা কম কেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "এইস্থলে বৈষ্ণবধর্ম্ম আছে বলিয়াই কম।" কথাটা আংশিকভাবে সত্য বটে। বৈষ্ণবধর্ম্মে ব্রাহ্মণদের কঠোরতা ও ছুঁৎমার্গ নাই। কাজেই ইহার অপেক্ষাকৃত উদার ছায়ায় অনেকেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। নিত্যানন্দকে তাঁহার ভক্তগণ "পতিত পাবন" বলেন। তিনি স্বীয় জীবনের প্রত্যেকটি বিষয়ে ব্রাহ্মণদের বিপক্ষতাচরণ করিয়া সকলকে কোলে নিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু-বাংলার প্রথম সমাজ-বৈপ্লবিক ছিলেন।

---

(৬৫) "অমিয়-নিমাই-চরিত"—ষষ্ঠ খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ২৭০ ;
ও H. P. Shastri's Introduction to N. N. Vasu's "Modern Buddhism in Orissa", এবং রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী।

৪

পরবর্ত্তী যুগ

এই সম্প্রদায়ে অদ্বৈত গোস্বামী একজন বড় নেতা এবং চৈতন্যের অগ্রগামী ছিলেন। ইঁহার বড় কাজ হইতেছে ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত করা। ইতিপূর্ব্বেই ইঁহার কথা বলা হইয়াছে। ইঁহার বিষয়ে ঈশান নাগর বলিতেছেন,—

"ব্রহ্ম হরিদাস কহে মুঞি ম্লেচ্ছাধম
*　　　*　　　*
হরিদাস কহে মুঞি অস্পৃশ্য পামর
মোর অঙ্গ ছুঁই কেনে অপরাধী রহ ॥
প্রভু কহে নাহি বুঝি সজ্জাতি দুর্জ্জাতি
সেই কৃষ্ণে ভজে সেই শ্রীবৈষ্ণব জাতি ॥" (১)

হরিদাসের সঙ্গে মেলামেশার জন্য কুলীন ব্রাহ্মণেরা অদ্বৈতকে জাতে ঠেলিয়াছিলেন, "প্রভুরে পাষণ্ডগণ বর্জ্জন করিলা" [২]। পরে হরিদাস শান্তিপুরে অলৌকিক শক্তি দেখাইতে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। কিন্তু ইহা নারায়ণকে উৎসর্গীকৃত হয় নাই বলিয়া তিনি খান নাই। পরে ব্রাহ্মণেরা স্থির করিলেন,—

১। "অদ্বৈত প্রকাশ"—৯ম অধ্যায়, পৃঃ ৮১

২। অদ্বৈত প্রকাশ—৯ম অধ্যায়, পৃঃ ৯৪

"সাধু যে যতন করি অন্ন সমর্পিলা।
পিছে দ্বিজগণ অন্ন পরশ করিলা।

ব্রাহ্মণ সমাজে দেখি ব্রহ্ম হরিদাসে।
ঈষৎ হাসিয়া প্রভু কহে মৃদু ভাসে॥
প্রিয় হরিদাস কিবা ভাব প্রকাশিলা।
বহু ব্রাহ্মণগণের জাতি নাশ কইলা॥" (৩)

এই হরিদাসকে অদ্বৈত শ্রাদ্ধে খাওয়াইয়াছিলেন,—

"দ্বিজ থুইঞা হরিদাসে দিল শ্রাদ্ধ পাত্র
* * *
প্রভু কহে তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণভোজনের ফল। (৪)

এতদ্দ্বারা দেখা যায় যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা প্রথমাবস্থায় কি প্রকারের বৈপ্লবিক ছিলেন। সনাতনপন্থীরা তাঁহাদের কর্ম্ম একদম পছন্দ করিতেন না। এইজন্যই চৈতন্য বিষয়ে শ্রীঅচ্যুতকে বারাণসীতে দিগম্বরন্যাসী বলিয়াছিলেন,—

"বেদের বিরুদ্ধ কার্য্য করে সর্ব্বক্ষণ
যবন সংসর্গে নাহি মানয়ে দূষণ।" (৫)

আর চৈতন্য পুরীতে ব্রাহ্মণ দ্বারা পদসেবা করাতে আপত্তি করায়, ঈশান নাগর পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন,—

"এই ভাবি যজ্ঞসূত্র ছিঁড়িনু তখন।" (৬)

পুরীতে হরিদাস রূপ সনাতন কখনও মন্দিরে প্রবেশ করেন নাই, এবং

৩। অদ্বৈত প্রকাশ—৯ম অধ্যায় পৃঃ ৯৩
৪। „ „ „ „ পৃঃ ৯৫
৫। "অদ্বৈত প্রকাশ"—১৭শ অধ্যায়, পৃঃ ১৮৬।
৬। অদ্বৈত প্রকাশ—১৮শ অধ্যায়, পৃঃ ২০০।

অন্যান্য ভক্তদের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিতেন না। ইহা দীনতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে পর্য্যাপ্ত হইবে না। নিশ্চয়ই সমাজগত কোন খোঁটা ছিল। রূপ-সনাতনের বংশে যে কোন সামাজিক দোষ ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। আর হরিদাস ঠাকুর যে মুসলমান ছিলেন তাহাও এড়ান যায় না। তাঁহাকে এখন ব্রাহ্মণবংশজাত বলা হইতেছে। অথচ চৈতন্যভাগবত বলিতেছেন,—"জাতি, কুল সব নিরর্থক বুঝাইতে। জন্মিলে নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে।"[৭]

যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে কেন,—

"হরিদাসে দেখি কাজী বন্ধন করিল।
যবন হইয়া কেন হিন্দুধর্ম্ম আচরিল।" (৮)

পুনঃ—

"হরিদাসে দেখি কহে যবনের পতি।
কাহে হিন্দুয়ানী কর হঞা উত্তম জাতি"॥ (৯)

আবার মুলুকপতি কেন বলিলেন—

"আমরা হিন্দুরে দেখি নাই খাই ভাত।
তাহা ছাড় হই তুমি মহাবংশজাত।" ১০

(৭) চৈতন্যভাগবত—আ, ১৬-১৬-২৩৭।

(৮) নিত্যানন্দদাস—"প্রেমবিলাস", পৃঃ ২৩৫।

(৯) ঈশান নাগর—"অদ্বৈত প্রকাশ", ৯ম অধ্যায়, পৃঃ ৮৮।

(১০) চৈঃ ভাঃ—আদি খণ্ড, ১৬।৭২। এতদ্দ্বারা আমরা দেখি যে, তখনকার মুসলমানেরা হিন্দুদের সহিত একত্রে আহার করিতেন না। ইহার অর্থ—শাসকশ্রেণী শাসিতদের সহিত সাম্যভাবাপন্ন ছিলেন না। রাজনীতিক পরিস্থিতির বাস্তব অবস্থাকে ধর্ম্মের রূপ দিয়া এই প্রাচীর মধ্যযুগে তোলা হইয়াছিল। ইহাই শ্রেণীস্বার্থের তৎকালীন রূপ। পরে মুসলমানেরা ধর্ম্মের নামে সেই প্রথার অনুসরণ করেন।

এবং কাজীর বিচারে তিনি বাইশ বাজারে কোড়া খাইতেনও না। শ্রীচৈতন্য পুরীতে নরেন্দ্রসরোবরে সপারিষদ ভাগবৎ পাঠ শুনিতেছেন এবং তথায় হরিদাস দণ্ডায়মান আছেন—এইরূপ একটী চিত্র নাকি প্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় অঙ্কিত হইয়াছিল। এই চিত্রটী ঘুরিতে ঘুরিতে মুর্শিদাবাদে কুঞ্জঘাটার রাজাদের বাড়ীতে সুরক্ষিত হইয়া আছে এবং তাহার ফটো সর্ব্বত্র পাওয়া যায়[১১]। লেখক এই আসল চিত্রটি দেখিয়াছেন। নরতাত্ত্বিক চক্ষে এই চিত্রটিকে দেখিলে চৈতন্য প্রভৃতির বাঙ্গালীর মুখ বেশ ধরা পড়ে, আর হরিদাসের বলিষ্ঠ ও দীর্ঘ দেহ, বাঁকা নাক (acquiline) এবং গোঁপ দাঁড়িযুক্ত মুখ দেখিয়া Rohilla type বলিয়া মনে হয়। পুনঃ যে স্থলেই হরিদাসের চিত্র বা মূর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে তথায় তাঁহাকে হয় মুসলমান ফকিরের বেশে বা পাঠানের পরিচ্ছদে সজ্জিত করা হইয়াছে। যদি তিনি মুসলমান বংশীয় নহেন, তাহা হইলে তাঁহার এই জাতিতাত্ত্বিক চিহ্ন কেন প্রদান করা হয়?

হরিদাসকে যেমন হিন্দুরা ব্রাহ্মণ সন্তান বলিতেছেন, কবীর এবং দাদুর[১২] বিষয়েও তদ্রূপ গোলমাল আছে। শিখেরাও বলেন, এককালে অনেক মুসলমান শিখ হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন সে কথা গোপন করা হইতেছে। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় বলিতেছেন, "...এই সকল দেখিয়া মনে হয়, হরিদাস যবনকুলসম্ভূত ছিলেন"।[১৩]

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত কোনও এক সাহিত্যিক লেখককে বলিয়াছিলেন যে, হরিদাসের জন্ম বিষয়ে একটী সঠিক পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার পিতার নাম ছিল ইব্রাহিম ও তাঁহার নাম ছিল মহম্মদ আলি। লেখক এই পুঁথি স্বচক্ষে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করায়, দুই বৎসরেরও

(১১) দীনেশচন্দ্র সেন—History of Bengali Literature.

(১২) কবীর সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রামকুমার বর্ম্মা কৃত, 'হিন্দী সাহিত্যকা আলোচনাত্মক ইতিহাস' এবং দাদু সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন প্রণীত 'দাদু' দ্রষ্টব্য।

(১৩) শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী—পৃঃ ২৫৮।

অধিককাল তাঁহাকে ঘুরাঘুরি করিতে হইয়াছে। শেষে লেখককে বলা হইল যে, উহা তাঁহাদের Museum-এ সংরক্ষিত আছে। তথায় লেখক গমন করিলে তত্রত্য অধ্যক্ষ তাঁহাকে বলেন যে, সময়াভাব বশতঃ দেখান গেল না। কিন্তু ইঁহারা যে পুস্তকের তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উহা উল্লিখিত আছে বলিয়া অবগত করান। লেখক পুনরায় উক্ত সাহিত্যিকের নিকট গমন করেন। তিনি বলিলেন যে, এই পুস্তকের কিয়দংশ কোন এক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং উহা তিনি লেখককে পাঠাইয়া দিবেন; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন সংবাদই নাই। লেখক বিমানবাবুর পুস্তকে দেখিলেন, ইঁহাদের পুঁথি সমূহের অসম্পূর্ণ যে তালিকাটি তিনি সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তন্মধ্যে এই পুঁথির উল্লেখ নাই। যদি সত্যই এমন কোন পুঁথি থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রামাণিকতা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য সাধারণের নিকট তাহা প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয়।

নিত্যানন্দ অদ্বৈতের তিরোভাবের পর শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম দত্ত (ঠাকুর মহাশয়) ও শ্যামানন্দ গোস্বামী, ইঁহারাই বৈষ্ণবসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাসের নিকট হইতেই এই সংবাদ পাওয়া যায় যে, বাংলার বার "ভূঁইয়ার" অন্যতম রাজা বীরহাম্বীর শ্রীনিবাসের পুঁথির গাড়ী ডাকাত দিয়া লুট করাইয়া লন এবং পরে তাহা স্বীকারও করেন। বিষ্ণুপুরে রচিত প্রাচীন একটী কবিতাতে ইহা বর্ণিত আছে যে, শ্রীনিবাস পুঁথির গাড়ী হারাইয়া যে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি বীর হাম্বীরের পরিচয় কালে বলেন যে, রাজা জাতিতে ছত্রী রাজপুত, লুঠ-তরাজ করে ও মানুষ কাটিয়া ফেলে [১৪]। এতদ্দ্বারা এই তত্ত্ব পাওয়া যায় যে, একজন বড় সামন্ত রাজাও লুঠতরাজ করিয়া ধনসঞ্চয় করিতেছেন। অবশ্য বীর হাম্বীর বৈষ্ণব হইবার পর বৈষ্ণব লেখকেরা

১৪। Abhayapada Biswas, "History of the Bishnupur Raj".

ইহার অলৌকিক ব্যাখ্যা দিয়া আসল জিনিষ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নরোত্তম দত্ত খেতুরীর রাজার একমাত্র পুত্র এবং ইঁহার পিতা গৌড়ের সুলতানের প্রধান অমাত্য ছিলেন। তাঁহার এবং সপ্তগ্রামের রাজা হিরণ্যদাসের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ গোস্বামীর ত্যাগ বাংলায় অতুলনীয়! ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মণদের শিষ্য করিতেন এবং আশীর্ব্বাদকালে ব্রাহ্মণদের মাথায় পা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। ইহাতে ব্রাহ্মণগণ বিশেষ চটিয়া যান; কিন্তু বৈষ্ণব নেতারা বলিলেন,—

"নরোত্তমে যে-পাপিষ্ঠ শূদ্র বলি কয়
সবংশে সে-পাপিষ্ঠ নরকেতে যায়।"

ইঁহার বিপক্ষে ব্রাহ্মণরা বলিতেছেন,—

"ব্রাহ্মণেরে মন্ত্র দিয়া কৈলা সর্ব্বনাশ

* * * *

কোথা হইতে বৈষ্ণব মত আনি প্রচারিল।
যত দেবদেবী পূজা সব উঠাইল॥

* * * *

মৎস্য-মাংস সব ত্যাগ, নিরামিষ খায়
সংকীর্ত্তনে নাচে কাঁদে পাগলের প্রায়॥ (১৫)

নরোত্তম দাসের সম্বন্ধে শিশিরবাবু বলেন যে ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন, 'নাহি মানি দেবী-দেবা'। ঠাকুর মহাশয়ের সময়ে বৈষ্ণবগণের মধ্যে কোন কোন স্থলে যাগযজ্ঞ দেবদেবীর পূজা, এমন কি জাতিবিচার পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছিল[১৬]। ইনি বলিয়াছেন, "না করিবে অন্য দেব নিন্দন-বন্দন"। শ্যামানন্দ গোস্বামী সদ্গোপবংশীয় ছিলেন। ব্রাহ্মণবংশ ব্যতীত অন্যজাতীয় যে কয়জন গোস্বামিপদ পাইয়াছিলেন,

(১৫) "প্রেমবিলাস"—পৃঃ ১৯৩।

(১৬) "শ্রীঅমিয় নিমাইচরিত"—ষষ্ঠ খণ্ড; ৩য় সং ২৭৮।

শ্যামানন্দ তাঁহাদের অন্যতম। ইনিও ব্রাহ্মণ-শিষ্যের মাথায় পা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। ইঁহারই একটী পদাবলীতে আছে,

"ব্রাহ্মণে যবনে মিলি করাইল কোলাকুলি
পরতেকে দেখ একবার।" (১৭)

বীরচন্দ্র বা বীরভদ্র গোস্বামী নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর একমাত্র পুত্র। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, নিত্যানন্দের বিবাহ বিষয়ে নানামত আছে। সেইজন্য তাঁহারও "বীরভদ্রি" দোষ হয়[১৮]। নিত্যানন্দের বংশ-বিস্তার নামক গ্রন্থে আছে যে, তিনি বসুধাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন পুস্তকে বলা হইয়াছে যে, তিনি জাহ্নবী বা জাহ্নবা[১৯] দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার এক সহোদরা হয়, নাম গঙ্গা। ইঁহার বিষয়ে বলা হইয়াছে—

"সন্ন্যাসীর কন্যা কেহ বিভা করিতে না চায়।
মাধব আচার্য্য বিয়ে করে গুরুর আজ্ঞায়॥" (২০)

দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, "গঙ্গাবংশীয় জনৈক পণ্ডিত আমাকে নানা প্রমাণের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে বীরভদ্র গোস্বামী নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র নহে, এমন কি জাহ্নবী দেবী তাঁহার মতে পুরুষ। তিনি নায়িকাভাবে নিত্যানন্দ প্রভুর সেবা করিতেন। কিন্তু পণ্ডিতটী যেরূপ যুক্তি ও প্রমাণের বহর উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে নিত্যানন্দ প্রভুর বংশাবলীতে বিলক্ষণ গোলযোগ আছে"[২১]। লেখকের আত্মীয় এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য ৺ডাক্তার

(১৭) "শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী"—পৃঃ ১০।

(১৮) "সম্বন্ধনির্ণয়" দ্রষ্টব্য।

(১৯) "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"—পৃঃ ৩২৫ ; 'সম্বন্ধনির্ণয়' দ্রষ্টব্য।

(২০) "প্রেমবিলাস"—পৃঃ ২০৪।

(২১) "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"—পাদটীকা, পৃঃ ৩২৫।

রামচন্দ্র দত্ত সিমুলিয়ার ৺ত্রৈলোক্যনাথ গোস্বামীর সহিত একবার তর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন যে, নিত্যানন্দ যে বিবাহ করিয়াছিলেন তার কোন প্রমাণ নাই। ইহার প্রত্যুত্তরে গোস্বামী মহাশয় বুকে চপেটাঘাত পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, "ইহার প্রমাণ আমি।" ইহার পর রামবাবু রামকৃষ্ণের কাছে এই কথা উত্থাপন করেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "বীরভদ্র নিত্যানন্দের মানসপুত্র; তিনি বিবাহ করেন নি"। লেখক এই কথা রামবাবুর শিষ্য কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যানে (রামকৃষ্ণের সমাধিস্থল) ৺স্বামী যোগবিনোদের নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন। এইসব ব্যাখ্যা দ্বারা ইহা প্রতীত হয় যে, নিত্যানন্দের বিবাহ প্রচলিত সনাতন সামাজিক-পদ্ধতির প্রতিকূলাচরণ করিয়াছিল। তাহাকে ঢাকিবার জন্যই নানা প্রকারের কিংবদন্তীর সৃষ্টি হইয়াছে।

বীরভদ্র পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন এবং পিতার কার্য্যের ধারা আরও প্রসারিত করিয়াছিলেন। ইনি দুইটী বিবাহ করেন এবং নিজের শ্বশুর যদুনন্দনকে শিষ্য করেন[২২] এবং নারায়ণী দেবী তাঁর স্ত্রীদের মন্ত্র দেন। বীরভদ্র সম্পর্কে বলা হইতেছে,—

"বীরচন্দ্র গোসাঞি প্রভু ঈশ্বর অবতার।

* * * *

হরিনাম দিয়া উদ্ধার করে পতিত জন।
হিন্দু মুসলমান কিছু না করে গণন। (২৩)

বীরচন্দ্র একবার গৌড়ের সুলতানের সম্মুখে হাজির হইয়াছিলেন।

"পাদ্সাহ বলে তুমি ফকির সুজন।
আমার গৃহেতে আজি করহ ভোজন॥
শুনিয়া বীরভদ্র প্রভু মৃদু মৃদু হাসে।

(২২) নরহরি চক্রবর্ত্তী—"ভক্তিরত্নাকর", পৃঃ ১০১৬।
(২৩) ঐ ঐ পৃঃ ২৫০

যবনের গৃহে খাইলে হিন্দুর জাতিনাশ ॥
তবে যদি তোমা সবার খানা দেহ মোরে।
খাইব নিশ্চিত এই কহিব তোমারে।
পাদ্‌সাহ শুনিয়া হাসিল তখন
বাবুর্চ্চি খানা শীঘ্র কর আনয়ন ॥
* * *
এইরূপে তিনবার খানা আনাইল।
নানাবিধ ফুল তাহে দেখিতে পাইল ॥
পাদসাহ বলে গোঁসাই ঠাকুরপ্রধান।
ইচ্ছামত ঠাকুর তুমি কিছু লহ দান ॥"(২৪)

এই গল্প হইতে বুঝা যায় যে, একটা অলৌকিক (miracle) কার্য্যের উল্লেখ করা হইতেছে। এই সময়ে ভারতে মুসলমান পীর, সুফি ও ফকিরগণ অলৌকিক কার্য্যাদি দেখাইয়া জনসাধারণকে নিজেদের ধর্ম্মে আনয়ন করিতেন। বৈষ্ণবপ্রধানগণও ঐরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতেন।

বীরচন্দ্র খেতুড়ীর মহোৎসবে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় এক বড় বক্তৃতায় নরোত্তমের পক্ষে ওকালতি করিয়াছিলেন,—

"এই নরোত্তম কায়স্থকুলোদ্ভব হয়
শূদ্র বলি কেহ কেহ অবজ্ঞা করয়।
কৃষ্ণভক্ত জন হয় ব্রাহ্মণ হইতে বড়
যিঁহো শাস্ত্র মানে তিঁহো মানে করিছ দৃঢ়।
* * *
নরোত্তম মহাপ্রভু প্রেম অবতার
* * *
নিত্যানন্দের কলা তাঁরে ঈশ্বর বলি মান।
হৃদয় চিরি যজ্ঞোপবীত করাবে দর্শন ॥

---

(২৪) নরহরি চক্রবর্ত্তী—ভক্তিরত্নাকর—পৃঃ ২৫৩

এত কহি বীরচন্দ্র বিরত হইলা।
যজ্ঞোপবীত দেখাইতে সবে আজ্ঞা কইলা ॥
তইছে নরোত্তম গোঁসাঞি সবার আজ্ঞা মতে ॥
হৃদয় চিরি দেখাইলা শ্রীযজ্ঞোপবীতে ॥” (২৫)

শ্যামানন্দ সম্পর্কেও এই প্রকারের গল্প আছে। এতদ্দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মূল বিধান রক্ষা করিয়া ইঁহারা উদার হইয়া চেলার দল সৃষ্টি করিতেছিলেন। কিন্তু কথা এই যে, এইসব গল্পগুলির পরের যুগের সৃষ্ট কিনা? কার্য্যতঃ দেখা যায়, তাঁহারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিকূলাচরণ করিতেছিলেন। বৃন্দাবন দাস শ্রীনারায়ণীর গর্ভজাত সন্তান। তাঁহার জন্মবিষয়ে বদনাম আছে। প্রচলিত গল্প এই যে, নারায়ণী বালবিধবা ছিলেন। তিনি চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট খাইয়া গর্ভবতী হন।

“চৈতন্যের অবশেষ পাত্র নারায়ণী।
যারে সেই আজ্ঞা করে ঠাকুর চৈতন্য।
সেই আসি অবিলম্বে হয় উৎপন্ন ॥
এসব বচনে যার নাহিক প্রতীত
সদ্য অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত ॥” (২৬)

আবার অন্যত্র,

“প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা, বালিকা গর্ভিণী হৈলা।
লোকমানে কলঙ্ক বহিল, সুন্দর তনয় এক হৈল ॥ (২৭)

হালে নাকি এক পুঁথি বাহির হইয়াছে; তাহাতে তাঁহার পিতার নাম উল্লেখ আছে। অথচ শ্রীনিত্যানন্দ দাস বলিতেছেন,—

“কুমারহট্টবাসী বিপ্র বৈকুণ্ঠ দাস যে হোঁ। তার সনে নারায়ণীর

(২৫) নরহরি চক্রবর্ত্তী—ভক্তিরত্নাকর—পৃঃ ১৮৯

(২৬) চৈতন্য ভাগবত — মধ্যকাণ্ড

(২৭) শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিনীতে উদ্ধৃত পৃঃ ৩০৫

হইল বিবাহ॥ তাঁর গর্ভে জন্মিল বৃন্দাবন দাস।...বৃন্দাবন দাস যবে আছিলেন গর্ভে। তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠ দাস চলিলেন স্বর্গে।"[২৮] অন্যপক্ষে ইহাও কথিত আছে,—

"প্রভুর চর্ব্বিত পান স্নেহবশে কৈলা দান।

* * *

বালিকা গর্ভিণী হৈলা লোকমানে কলঙ্ক রহিলা॥' (২৯)

এই ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়, এখানেও আসল কথাটা চাপা রাখা হইয়াছে।

হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট অভিরাম স্বামী বাস করিতেন। ইঁহার সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, ইনি মুসলমানদের সঙ্গে আহার করিতেন।

"অভিরাম লীলামৃত" পুস্তকে (পৃঃ ১২) ইহার শক্তি বা পত্নী মালিনীকে "যবনী" এবং ভক্তিরত্নাকরে (পৃঃ ১২৭) ব্রাহ্মণকন্যা বলা হইয়াছে।[৩০] এখানেও অনুমান হয় যে, আসল ব্যাপার ধামা চাপা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

(২৮) প্রেমবিলাস—পৃঃ ২২২

(২৯) শ্রীগৌরপদতরঙ্গিনীতে উদ্ধৃত—পৃঃ ৩০৫

(৩০) শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান—পৃঃ ১৯।

৫

সমসাময়িক সংবাদ

বৈষ্ণব সাহিত্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য সমসাময়িক সংবাদ পাওয়া যায়। নরোত্তম বিলাসে উল্লিখিত আছে, জাহ্নবীদেবী একদল ব্রাহ্মণ দস্যুর মন ফিরাইয়া তাহাদিগকে ভক্ত করিয়াছিলেন: "শুনি অশ্রুযুক্ত হইয়া কহে সর্ব্বজন। বঙ্গদেশী দস্যু মোরা, বিপ্র দুরাচার। প্রায় চাঁদরায় কর্ত্তা হন মো সবার।...শুনিতেই মো সবার ফিরি গেল মন।"[৩১]

এই চাঁদরায় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী ছিলেন। বাদ্‌সাহের সৈন্যদলকে ইনি পরাজিত করিয়া রাজকর পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দেন। ইঁহার সঙ্গে ছিলেন কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, নীলমণি মুকুটি প্রভৃতির একদল ব্রাহ্মণ দস্যু। ইঁহাদের সম্বন্ধে সংবাদ এইরূপ বর্ণিত আছে, "পূর্ব্বে তারা চাঁদরায়ের সৈন্য যে আছিল। চাঁদরায়ের সনে বহু দস্যুবৃত্তি কৈল।.. যুদ্ধ করি যবনেরে কৈলা পরাজয়॥ নানাদেশ লুঠে রাজ্য করয়ে বিস্তার। ভয়েতে যবনরাজ নহে আগুসার॥"[৩২] আবার, "জলা পন্থের জমিদার হরিশ্চন্দ্র রায়। দুষ্ট পাষণ্ডী দস্যু দেশ লুঠি খায়। শ্রীঠাকুর নরোত্তম তারে কৃপা কৈলা। পরে হরিদাস নাম তাহার হইলা।"[৩৩] পুনঃ, "রাঘবেন্দ্র রায়ের হয় দুই কুমার। মহাদস্যু রাজদ্রোহী দুষ্ট দুরাচার।"[৩৪] এতৎসঙ্গে মুসলমান দস্যুরও সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। "আর শাখা যবন

(৩১) "নরোত্তম বিলাস"—১০ম বিলাস, পৃষ্ঠা ১৬৬
(৩২) "প্রেমবিলাস"—পৃঃ ১৮৮
(৩৩) ঐ পৃঃ ২০৭
(৩৪) ঐ পৃঃ ঐ

দস্যু শের খাঁ নাম যাঁর। শ্রীচৈতন্য দাস নাম এবে তাঁর॥" এই শের খাঁর বিষয়ে অন্যত্র বলা হইয়াছে, তিনি বাদসাহের আত্মীয়[৩৫] এবং মেদিনীপুরের কোন স্থানের রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। কুতুবুদ্দিন নামে জনৈক দস্যুদলপতির নামোল্লেখও এই সঙ্গে আছে; এই দল জাহ্নবী দেবীর অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়।[৩৬]

বৈষ্ণবসাহিত্যে ইহাদিগকে দস্যু আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু মধ্যযুগে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ডাকাতি করা ভদ্রলোকের এবং বীরদের কর্ম্ম ছিল। প্রাচীনকাল হইতে মধ্যযুগ পর্য্যন্ত পরস্বাপহরণ এবং cattle lifting প্রভৃতি প্রাচীন বীরদের ধর্ম্ম ছিল। এইসব বিষয়ে ইলিয়াডের আখিলিউস্ এবং মহাভারতের ভীষ্মও বাদ যান না। যখন রাজনীতিক ধর্ম্ম "জোর যার, মুল্লুক তার" এবং যার ক্ষমতা সর্ব্বাধিক, সে-ই স্বাধীন রাজা বলিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিত, তখন এইসব ব্যক্তিদের নীচ ডাকাত বলিয়া ঘৃণা করা ঠিক হইবে না। ইহা ছিল যুগধর্ম্ম। বাংলার সামন্ততন্ত্রীয়যুগের শেষকালে ইহারাই ছিল stark mass-troopers। সার ওয়াল্টার স্কটের রচনাবলীতে এই প্রকারের নাইটদের সম্বন্ধে বর্ণনা—

"Penance father will I none,
Prayer know I hardly one,
Save to patter an Ave Mary,
When I ride on a border foray."······
(Lay of the last Ministrel)

এই বাঙ্গালী mass-troopersদের প্রতিও প্রযোজ্য। চাঁদরায় বাদশাহকে পরাজিত করিয়া স্বাধীন জীবন যাপন করিতেন। তিনি বাদশাহী সনদ লইয়া ক্ষুদ্র ভুঁইয়া-রাজা হন নাই। অমিয় নিমাইচরিতে বর্ণিত আছে

(৩৫) "শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৬৯

(৩৬) "প্রেম বিলাস, পৃঃ ১৮৫

যে, তাঁহার এক লক্ষ ফৌজ ছিল। তাহা হইলে তিনি কি প্রকারের ডাকাত ছিলেন?

অবশ্য, এই চাঁদরায় বিক্রমপুরের ভৌমিক চাঁদরায় নহেন। সেইযুগে ভারতের বাহির হইতে দলে দলে বিদেশীদের বাংলায় আসিয়া বাহুবলে নিজেদের ক্ষমতা বিস্তার করিবার যে অধিকার ছিল, চাঁদরায় প্রভৃতিরও তাহাই ছিল। বরং এইসব সংবাদে মধ্যযুগীয় বাঙ্গালী জীবনের চিত্র কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশ পায়। ইহাদের মধ্যে দেখা যায়, তৎকালে বাংলার হিন্দুরা নিতান্ত দুর্ব্বল ছিল না। দুঃখের বিষয় এই যে, তাহাদের জীবনের অন্যদিকের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবভক্তেরা ইহাদের দস্যু ও পাষণ্ডী বলিয়াই শেষ করিয়াছেন।

বৈষ্ণবসাহিত্যে আর একটি রাজনীতিক সংবাদ পাওয়া যায়। রঘুনাথদাস গোস্বামীর পিতা হিরণ্যদাস সপ্তগ্রামের রাজা ছিলেন। তিনি বিশ লক্ষ টাকা প্রজাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিতেন, এবং তন্মধ্য হইতে বাদশাহকে বার লক্ষ টাকা বাৎসরিক কর প্রদান করিতেন। ঐ স্থানের পদচ্যুত মুসলমান শাসনকর্ত্তা বাদশাহের নিকট অভিযোগ করে যে, এই রাজা যেই পরিমাণ রাজকর দেয়, সেই পরিমাণ টাকা অন্যান্য উপায়ে তিনি প্রজাদের নিকট হইতে আদায় করেন; কিন্তু সেই টাকা দরবারকে ফাঁকি দেয়। আবার হরিদাস ঠাকুরের জমিদার রামচন্দ্র খাঁর অপকীর্ত্তির বিষয় বর্ণনাপ্রসঙ্গে চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন, ইনি বাদশাহকে কর দিতেন না। অবশেষে বাদশাহ লোক পাঠাইয়া তাহাকে বাঁধিয়া আনিবার আদেশ প্রদান করেন। তদনুরূপ কার্য্যও হইয়াছিল। এক্ষণে প্রশ্ন এই, এই সব রাজা বা জমিদারেরা কি সর্ত্তানুসারে (tenure) জমিভোগ করিত? পূর্ব্ববর্ণিত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, বাদশাহ একটা জমিদারীতে একজনকে তাড়াইয়া অপর একজনকে বসাইতে পারিতেন। খাজনা বন্ধ হইলেই জমিদারী হস্তান্তরিত হইত। ইহা পরবর্ত্তী মোগলযুগের

"ঠিকাদারী প্রথারই" অনুরূপ। অনুমিত হয় যে, জমিদারীতে তৎকালের জমিদারদের কোন স্থায়ী স্বত্ব ছিল না।[৩৭] আবার, এই সময়ের অত্যাচারী জমিদারের সংবাদও পাওয়া যায়ঃ—"রাজপীড়া ছিল গ্রামে কত উপহতি। তাহা শান্তি হৈল রাজা করিল পিরীতি"।[৩৮]

বৈষ্ণবসাহিত্য বলে, হরিদাস ঠাকুর যখন খুলনা জেলায় বেনাপোলে তপস্যা করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাকে ভুলাইবার জন্য তাঁহার জমিদার এক বেশ্যা পাঠাইয়া দেয়। প্রেমবিলাসে উল্লিখিত আছে, "কাজীর প্রেরিত বেশ্যা তথায় আসিলা। মোগলবংশীয়া বেশ্যা পরমা সুন্দরী।"[৩৯] এক্ষণে প্রশ্ন উঠে, কাহার সংবাদ ঠিক? হরিদাস ঠাকুরের অন্তর্ধানের বহু পরে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছিল। সেইজন্যই বোধ হয় গল্পটা গোলমাল হইয়াছিল। হরিদাসের সময়ে ভারতবর্ষে মোগল ছিল না, এবং প্রেমবিলাস লিখিবার সময় বোধ হয় বাংলায় মোগলের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে। গ্রন্থকার যখন কাজী কর্তৃক এই রমণীকে প্রেরণ করাইতেছেন, তখন মোগল বাদশাহের কাজী নিশ্চয়ই মোগল-রমণী পাঠাইয়াছিলেন, এই ধারণা গ্রন্থকার হয়ত স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিম্বা হরিদাসের মুসলমান-জন্মের উপর জোর দিবার জন্যই কি মুসলমান কাজীর দ্বারা মুসলমান বেশ্যা পাঠাইবার গল্পটা সৃষ্ট হইয়াছিল?

(৩৭) খোন্দকার ফজলে রবি খাঁ—"বাঙ্গালার মুসলমানের আদি বৃত্তান্ত," অনুবাদক আব্দুল হামিদ খাঁ দ্রষ্টব্য। ইনি বলেন, "সম্পত্তিতে তাঁহাদের অধিকার ছিল না। তাঁহারা অপরাধের জন্য ডিস্‌মিস্ বা বরতরফ হইতেন।" পৃঃ ৭৪

(৩৮) প্রেমবিলাস—১ম বিলাস।

(৩৯) "প্রেমবিলাস"—পৃঃ ২৩৫।

৬

সামাজিক সংবাদ

সমসাময়িক হিন্দু-সমাজের সংবাদ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবরণগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়। জয়ানন্দ বলিতেছেন—

"পদ্মাবতী নামে নদী আছে বঙ্গদেশে
ব্রহ্মক্ষত্রী বৈশ্য শূদ্র তার তীরে বাস।"১

এক্ষণে কথা হইতেছে, এই ব্রহ্মক্ষত্রী জাতির লোকেরা কোথায় গেল? সেনবংশীয় রাজারা নিজেদের ব্রহ্মক্ষত্রী বলিতেন। গুজরাটে এই নামে একটি জাতি আছে। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর বলেন, তিনি প্রাচীন ভারতের পাঁচটি রাজবংশের নাম পাইয়াছেন, যাঁহারা এই জাতিগত বলিয়া পরিচয় দিতেন। "ব্রহ্মক্ষত্রী" শব্দের অর্থ হইতেছে, "ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ", অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণ। আবার ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ-বৃত্তিধারী হইলেও এই নামে অভিহিত হয়; পুরাণ সমূহে (২) এবম্প্রকারের অনেক বংশের নামোল্লেখ আছে। ভবভূতির "মহাবীর চরিতে" ঋষি বিশ্বামিত্রের মুখে উক্ত হইতেছে যে তিনি ব্রহ্মক্ষত্রী। তাহা হইলে এই স্থলে অর্থ হইবে "ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ।" সংস্কৃত ধর্ম্মপুস্তকেও এই প্রকারের অনেক উদাহরণ আছে। যখন এই নামধারী একটা রাজবংশ বাংলায় ছিল তখন তাঁহাদের আত্মীয় কুটম্বেরাও নিশ্চয়ই এদেশে ছিলেন। এই সময়ে সংস্কৃতভাষায় লিখিত (ষোড়শ শতাব্দীর বলিয়া অনুমিত) একটি পুস্তক কিছুদিন পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই পুস্তকের নাম "সেখ শুভোদয়া"।

(১) "চৈতন্য মঙ্গল"—পৃঃ ৪৮

(২) 'বায়ুপুরাণ"—৮৮ অধ্যায় ৫, ৭ এবং মৎস্যপুরাণ" ৫০, ১৫ দ্রষ্টব্য।

ইহা লক্ষণ সেনের মন্ত্রী হলায়ুধ কর্তৃক লিখিত। সমালোচকেরা বলেন, টোডরমল্ল যখন বাংলার মোগল শাসনকর্তা ছিলেন তখন জমি-সংক্রান্ত দলিল-স্বরূপ এই পুস্তক গৌড়ের কোন মসজিদের মাতোয়ালী তাঁহাকে দেখান। কিন্তু ইহার মধ্যে যে সেনযুগের বাংলার সমাজের কিঞ্চিৎ সংবাদ বা জনশ্রুতি আছে তাহাতে সংশয় নাই। ইহাতে "রাজপুত্র" নামে একটি জাতির উল্লেখ আছে। একটি গল্পে উল্লেখ আছে, কোন এক রাজপুত্রের গলায় তাঁতি-বসাকের জন্য আনীত মালা মন্ত্রী ধোয়ীর পরামর্শে তাহার গলায় দেওয়া হইয়াছিল। পরদিন সে লক্ষণসেনের সভায় গিয়া নালিশ করে। তাহাতে রাজা তাহাকে তাহার জাতিনাশের কোন ভয় নাই বলিয়া সান্ত্বনা দেন ; কারণ "রাজা তাহার স্বজাতি।"

"জ্ঞাত্বা রাজা তং রাজপুত্রং প্রবোধয়ামাস

*　　*　　*

শ্রীমতা সহ স্বজাতীয়োঽহম্" ॥ ৩

স্মরণ রাখিতে হইবে, "রাজপুত্র" অর্থে "রাজার ছেলে" নয়। ইহার অর্থ "রাজপুত"। প্রাচীন সংস্কৃতপুস্তকে জাত্যর্থে 'রাজপুত্র" শব্দ ব্যবহৃত হইত**। বাংলা এবং হিন্দিতেও সেই অর্থে "রাজপুত" শব্দ ব্যবহৃত হইত। অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন মহাশয়ও সেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন[৪]। তাহা হইলে দেখা যায় যে, 'রাজপুত' বলিয়া বাংলায় একটি জাতিও ছিল। অবশ্য 'সেখ শুভোদয়া'র এই ব্যক্তি রাজার জ্ঞাতি, অতএব রাজপুত্র, এই অর্থ করা যায় না। কারণ লক্ষ্মণ সেন তাহাকে স্বজাতি বলিয়া সম্বোধন করিতেছে, জ্ঞাতি বলে নাই।

---

(৩) ডাঃ সুকুমার সেন—'সেখ শুভোদয়া", পৃঃ ১৩১

* * সংস্কৃত বল্লাল চরিতে 'রাজপুত্র' শব্দ আছে, 'ক্ষত্রাম্নাৎ ব্রাহ্মণাচ্ছেত্রী রাজপুত্রো য উচ্যতে', শেষ পৃষ্ঠা ১০ম শ্লোক।

(৪) "সেখ শুভোদয়া ; পৃঃ ১৬৯

চৈতন্যযুগের পূর্ব্বে দনুজমর্দ্দন দেব যখন বঙ্গজ কায়স্থদের 'সমীকরণ' করেন, সেই সময়ে কায়স্থ গোষ্ঠীর তালিকা প্রস্তুত করেন দ্বিজ বাচস্পতি। তিনি কায়স্থদের তালিকা বিষয়ে বলেন, "এতে সপ্তবিংশা কায়স্থা (বঙ্গজ কায়স্থ) বংশহেতু প্রতিষ্ঠিতাঃ। এতদ্‌ভিন্নাঃ রাজপুত্রাঃ ন কায়স্থাঃ কদাচন"।[৫] এইস্থলে এই শ্লোকের শেষার্দ্ধের অর্থ কি ইহা নহে যে এতদ্ব্যতীত, অর্থাৎ এই ২৭ ঘর কায়স্থ ছাড়া বাকি সব জাতিতে রাজপুত ?[৬] এতদ্দ্বারা কি ইহা সূচিত হয় না যে, বাংলায় রাজপুত বলিয়া একটি জাতি ছিল এবং উহা পরে কায়স্থ জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে মুসলমান যুগে অনেক পশ্চিমাগত রাজপুতজাতীয় লোক বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের অন্তর্ভুক্ত হন। কায়স্থদের কুল পঞ্জিকায় তাহার উল্লেখ আছে, এবং সমাজপতিরাও তাহা অস্বীকার করেন না। এই সব বংশের কথা এই স্থলে বলা হইতেছে না।[৭] ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম্মের পুনরুত্থানের পর যখন উত্তর-ভারতে "রাজপুত" বলিয়া একটি জাতির উদ্ভব হয় সেই সময়ে বাংলা কি তাহার প্রভাব হইতে বাদ পড়িয়াছিল ? উপরোক্ত দুইটি দৃষ্টান্ত হইতে এইটুকু বোধগম্য হয় যে, চৈতন্য এবং তাঁহার অব্যবহিত কিছু পূর্ব্বে বাঙ্গালায় অনেক গোষ্ঠী ছিল, যাঁহারা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিত। বীরভূম জেলায় অনেক বাঙ্গালী গোষ্ঠী আছে, যাঁহারা রাজপুত বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন অথচ গলায় পৈতা নাই। ইহারা কায়স্থসমাজের সহিত মিশিয়া যাইতেছেন। এই বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান

(৫) নগেন্দ্রনাথ বসু—"বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস", রাজন্য কাণ্ড পৃঃ ৩৭০

(৬) বিভিন্ন পণ্ডিতকে দেখাইয়া এই অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবুর পুস্তকে প্রদত্ত অর্থ সমীচীন নয় বলিয়া মনে হয়। ব্যক্তিগতভাবে লেখকের নিকট তিনি উক্ত অর্থই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৭) ৮ নগেন্দ্রনাথ বসুর 'Ethnology of the Kayasthas' নামক পুস্তকে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদের বিষয়ে মালাধর ঘটকের কুলজী দ্রষ্টব্য।

প্রয়োজন। চৈতন্যের সময়ে হিন্দুবিবাহের বিধি-নিষেধ যে আজকালকার মত শক্ত ছিল না, তাহার প্রমাণ প্রেম-বিলাসেও পাওয়া যায়। নিত্যানন্দের কন্যা গঙ্গার বারেন্দ্রশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ মাধবাচার্য্যের সঙ্গে বিবাহোপলক্ষে বলা হইয়াছে,—

"রাঢ়ী, বারেন্দ্র বিপ্রে হইয়াছে অনেক।
দেশ ভেদে নাম ভেদ এই পরতেক" । ৮

প্রেম-বিলাস এই বিবাহোপলক্ষে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থের আগমন বিষয়ে প্রচলিত কাহিনীটির উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহারা বলেন, এই গল্পটি আড়াইশত বৎসরের পূর্ব্বে সৃষ্ট হয় নাই, তাঁহারা এই কথা পুনঃ বিবেচনা করিবেন। পরলোকগত দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, প্রেমবিলাসের বয়স সাড়ে তিন শত বৎসর[৯]। এই বিবাহোপলক্ষে প্রেমবিলাসে কান্যকুব্জ বংশাগত ব্রাহ্মণবংশীয়দের নামের তালিকার মধ্যে নিম্নলিখিত নামগুলি পাওয়া যায় যথাঃ—ওঝা, অধ্যর্য্যু, ভট্ট, মিশ্র, চতুর্ব্বেদী, আচার্য্য,[১০] প্রভৃতি।[১১] এই সঙ্গে প্রেম বিলাসে লিখিত আছে,

"পঞ্চ ঋষির সঙ্গে দিলা ভৃত্য পঞ্চজন,
পঞ্চ ঋষির রক্ষা সেবা করিবার কারণ,
*　　*　　*
যোদ্ধবেশী এই পঞ্চ ভৃত্য হন ক্ষত্র,
ক্ষত্রিয় কায়স্থ এই ভৃত্য পঞ্চজন।" ১২

এই গল্পে এই পঞ্চ কায়স্থদের ব্রাহ্মণের দাসও বলা হইতেছে, আবার ক্ষত্রিয়ও বলা হইতেছে। উক্ত গ্রন্থের লেখকের বোধ হয় জানা ছিল না

(৮) "প্রেমবিলাস"—পৃঃ ২১৪
(৯) "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"—পৃঃ ৩৩১
(১০) এই পদবীগুলি পশ্চিমের কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে আজিও প্রচলিত আছে।
(১১) "প্রেমবিলাস" পৃঃ ২৬৬
(১২) ঐ পৃঃ ২৬২

যে, ক্ষত্রিয় কথনও ব্রাহ্মণের দাস হয় নাই। পক্ষান্তরে ইহা হইতে এই সংবাদটী প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, কায়স্থদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীও পুরাতন। এই গল্পের শেষে কান্যকুব্জ হইতে আগমনের তারিখও প্রদত্ত হইয়াছে।

"বেদবাণ নবমান ৯৫৪ শকাব্দের যখন।
পঞ্চমহর্ষি কৈলা গৌড়ে আগমন" ॥ ১৩

এতদ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, এই প্রবাদ অতি পুরাতন। পুনঃ বল্লাল চরিতে কান্যকুব্জ হইতে আগমনের গল্প বিবৃত আছে। এই পুস্তক চৈতন্যের সময়ে লিখিত হয়। এতৎসমূহ হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এই প্রবাদ হালে সৃষ্ট হয় নাই। ইহার মূল্যে কিছু ঐতিহাসিক সত্যও নিহিত আছে।

এই স্থলে প্রেমবিলাস বলিতেছে যে, অনেক ব্রাহ্মণবংশ দারিদ্র্যের দায়ে ঠেকিয়া নীচকর্ম্মে নিযুক্ত হয় এবং তথা-কথিত নিম্নজাতিদের পুরোহিত হয়ঃ—

"অনেক বংশজ শিল্পকার্য্যে মন দিল।
গোয়ালা, কুমার, যুগী, তাঁতীর পেশা কষ্ট-শ্রোত্রির আর বংশজের গণ। তার মধ্যে বহু হইল বর্ণের ব্রাহ্মণ" ।১৪

অনেক ব্রাহ্মণ আবার,

"বল্লাল সময়ে বহু অগ্রদানী হইল।
পরেও বহু বংশজ তাহাতে মিলিল" ॥ ১৫

প্রেমবিলাসে আরও বলা হইয়াছে, বাগদত্তা কন্যার বিবাহ না হইলে মুস্কিল হয়ঃ "সেই কন্যা অন্যপূর্ব্বা দোষে দুষ্টা হয়। তার অন্নজল কেহ স্পর্শ না করয়।......কদাচিত পতিত ব্রাহ্মণে বিবাহ করয়.. ব্রাহ্মণের ব্যজ্য সমাজে নাই স্থান।"[১৬] এই অনুষ্ঠানটি মনুর পুনর্ভূ কন্যার বিবাহের প্রতিধ্বনি।

---

(১৩) "প্রেমবিলাস" পৃঃ ২৬২
(১৪) ঐ পৃঃ ১৮৯
(১৫) ঐ পৃঃ ১৮৯
(১৬) ঐ পৃঃ ২৯৩

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, কনৌজাগত ব্রাহ্মণদের বংশধরেরা অবস্থাহীনতার জন্য নিজেদের বংশাভিমান ত্যাগ করিয়া নানা কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এই সময়ে দেবীবর ঘটকের পুস্তকে দেখা যায় যে, রাঢ়ের ব্রাহ্মণেরা স্বহস্তে লাঙ্গল পরিচালনা করিত। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেগেছেন যে, বর্ণ-বিপ্রগণ পূর্ব্বে বৌদ্ধ-পুরোহিত ছিল। কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে উল্লিখিত"বর্ণবিপ্রগণ মঠপতি",[১৭] এই উক্তিকে তিনি তাঁহার মতের প্রামাণিকতার জন্য টানিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে দেখা গেল যে, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণবংশের অনেকে বর্ণব্রাহ্মণ হন, এবং তাহাদের বংশের পদবী তাহার প্রমাণ। এদেশে একটা ধারণা আছে যে, অগ্রদানী ও দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা বাহ্লীক হইতে আগত "মগ" বা "শকদ্বীপী" ব্রাহ্মণ-বংশীয়। কিন্তু এখানে দেখা যাইতেছে যে, অনেক কনৌজিব্রাহ্মণদের বংশধরেরাও অগ্রদানী হইয়াছিল। এই সময়ে অন্যান্য প্রদেশ হইতেও বাংলায় আসিয়া অনেকে বাঙ্গালী সমাজভুক্ত হইতেছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। রূপ-সনাতনেরা কর্ণাট বংশোদ্ভব ছিলেন। ভক্তিরত্নাকরে উল্লিখিত আছে,—

> "কর্ণাট-দেশাদি হৈতে আইলা বিপ্রগণ
> সনাতন রূপ নিজ দেশস্থ ব্রাহ্মণে
> বাসস্থান দিলা সবে গঙ্গা সন্নিধানে"।[১৮]

এখন ইঁহাদের পৃথক্‌সত্তা কোথায় ?

পূর্ব্বে চৈতন্যের পিতৃপুরুষদের বিষয় উল্লেখপূর্ব্বক জয়ানন্দের উক্তির বিষয় বলা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীহট্টের বৈদিক সাম্প্রদায়িকশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বলেন, চৈতন্যদেবের বংশ তাঁহাদের শ্রেণীভুক্ত, এবং তাঁহারা মিথিলাগত বলিয়া নিজেদের দাবী করেন। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় একটি

(১৭) "কবিকঙ্কণ চণ্ডী ১ম ভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত— পৃঃ ২৬৪

(১৮) ভক্তিরত্নাকর পৃঃ ৮২

সংবাদ দিতেছেন, "শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের মাতুল দুই বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথম বিবাহ বৈদিকশ্রেণীর কন্যা......দ্বিতীয় বিবাহ রাঢ়ীশ্রেণীর কন্যা।"১৯ এই যুগের অপর একটি সংবাদ এই যে, আকবরের রাজত্বের দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে কর্ণাটক হইতে নিমরায় নামে এক ব্যক্তি বিক্রমপুরের "ফুলবাড়ি" নামক স্থানে বাস করেন। ইঁহারই বংশে কায়স্থবংশীয় বিখ্যাত ভুইয়া চাঁদ রায় ও কেদার রায় জন্মগ্রহণ করেন।২০ এইসব দৃষ্টান্ত দ্বারা এইটুকু বুঝা যায় যে, বিভিন্নস্থানের লোক বাংলায় আসিযা নানাজাতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তখন বঙ্গীয় সমাজের বর্ত্তমান সঙ্ঘবদ্ধতা হয নাই, অর্থাৎ লেখক যাহাকে "দ্বিতীয় জাতীয় সমীকরণ"২১ (second social integration) বলিযা অভিহিত করেন তাহা হয় নাই। তখনও হিন্দুসমাজ নিজের দ্বার অর্গলাবদ্ধ করে নাই। এইজন্যই তখনও বাহিরের লোক বাঙ্গালী সমাজে প্রবেশ করিতেছে এবং বিভিন্নশ্রেণীর মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদান চলিতেছে। এই সমযকার আর একটি সংবাদ এই যে, হিন্দু রাজাদের বাড়ীতেও খোজা চাকর থাকিত। "শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয" নাটকে উল্লেখ আছে যে, রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজ অন্তঃপুরে খোজা চাকর থাকিত :—

"হেনকালে সৌরিদল্ল ২২ আসিল রাজা স্থানে

*   *   *   *

খোজা কহে দেবী সব পাঠাইল মোরে।"২৩

(১৯) শ্রীযোগেশচন্দ্র গুপ্ত—"কেদার রায়," পৃঃ ৯৫।

(২০) Dr. Wise—Asiatic Society's Journal—1874

(২১) Vide Dr. B. N. Datta—"Modern Review" : 1937, July. September.

(২২) নৈষধ চরিতে "সৌবীদল্ল" শব্দ আছে, অর্থ "কঞ্চুকী"।

(২৩) "শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক" (বাংলায় ভাষান্তরিত) ১০ম অঙ্ক।

৭

রাজনীতিক সংবাদ

ইতিপূর্ব্বে জমিদারদের অবস্থার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। এই সাহিত্যে আরও কিছু রাজনীতিক সংবাদ পাওয়া যায়। দেখা যায়, বাদশাহ হোসেন শাহ হিন্দুকর্ম্মচারী পরিবেষ্টিত হইয়া রাজকর্ম্ম পরিচালনা করিতেন। যেমনি রূপসনাতন তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন, তেমনি নরোত্তম ঠাকুরের পিতা কৃষ্ণদত্তও প্রধান অমাত্য দিলেন। মালাধর বসু একজন বড় কর্ম্মচারী ছিলেন,—তাঁহার শরীর-রক্ষক সৈন্যদলের সেনাপতি ছিলেন, কেশব বসু ঃ—

"মন্ত্রী সঙ্গে তাহাতে উঠিলা গৌড়েশ্বর
*   *   *   *
কেশব বসু নাম সঙ্গে ছিলা পাত্রবর" ॥ ১

ইঁহাকেই চৈতন্যচরিতামৃতে ভুলবশতঃ "কেশব ছত্রী" বলা হইয়াছে।২ কিন্তু পরলোকগত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন, "ছত্রনাজি একটি পদবী মাত্র ;—যেমন সাকর মল্লিক ও দবিরখাস। আসলে ইনি বর্দ্ধমানের কুলীন-গ্রামের কেশব বসু। ইনি পুরন্দর খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইঁহারা পাঁচ ভাই উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ;—ইনি ছত্রনাজির পদে প্রতিষ্ঠিত থাকায় প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থে কেশবছত্রী নাম প্রয়োগ হইয়াছে।"৩ উড়িষ্যার রাজার বিষযে শোনা যায় যে, তিনি একজন প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি ছিলেন। নগেনবাবু বলেন, তিনি প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন ;৪ পরে চৈতন্যের ভক্ত হন এবং বৌদ্ধ-দলন করেন। এই রাজার সহিত

(১) "শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক" (বাংলায় ভাযান্তরিত)— ৯ম অঙ্ক।

(২) চৈতন্য চরিতামৃত—১ম পরিচ্ছেদ।

(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ড ; ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৩।

(৪) N. N. Basu, 'The Modern Buddhism and its followers in Orrissa"—পৃঃ ৭০।

হোসেন সাহের যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই সময়ে ত্রিশূল পুঁতিয়া দুই রাজ্যের সীমানা নির্দ্ধারণ করা হইত। এক রাজ্যের প্রজা আর এক রাজ্যে প্রবেশ করিবার কালে "ডুরি" নিতে হইত। ইহা ছাড়পত্র বা passportএর ন্যায় ছিল। পথিকদের নূতন রাজ্যে প্রবেশকালে মাশুল (কর) দিতে হইত। এই সময়ে তাহাদের উপর জোর জবরদস্তি প্রয়োগ করা হইত।

"উড়িয়া জগাতি সব বড়ই দুর্ম্মতি
* * * *
ঘাটে ঘাটে ওড্রদেশে জগাতি বিস্তর
মোর প্রভুরগণ বিনা সবে দেই কর"।৫

চৈতন্যের দল এই মাশুল হইতে অব্যাহত ছিলেন বটে, তবু একবার বাঙ্গালী ভক্তদের উড়িষ্যা প্রবেশকালে অত্যাচার ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে পশ্চিম বঙ্গের কিয়দংশ উড়িষ্যার রাষ্ট্রান্তর্গত ছিল। এই প্রসঙ্গে একটি ব্যাপার উল্লেখযোগ্য যে, প্রাদেশিকতা তৎকালে এত তীব্র ছিল না যতটা আজকাল হইয়াছে। চৈতন্য ও রূপ সনাতনের অনেক অ-বাঙ্গালী শিষ্য ছিল এবং প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত ছিল বাসুদেব সার্ব্বভৌম। তিনি ছিলেন বাঙ্গালী। সনাতন গোস্বামী উড়িষ্যার বৌদ্ধদের শিষ্য করেন।৬ এইরূপে পশ্চিমের এবং পাঞ্জাবের ভক্তদের সাহায্যে রূপ-সনাতন বৃন্দাবন পুনঃ সংস্কার করেন :—

"হেনকালে মুলতান দেশীয় একজন
* * * *
কপূর ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ নাম কৃষ্ণদাস
নৌকা হইতে নামি আইলা গোস্বামীর পাশ
* * * *
সনাতন তারে বহু অনুগ্রহ কইল"।৭

---

(৫) "শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক"—৯ম ও ১০ম অঙ্ক।
(৬) The Modern Buddhism, পৃঃ ৭৪, ১২৫।
(৭) ভক্তি রত্নাকর—পৃঃ ৯৩।

ভক্তদের সামাজিক স্তর

এই সকল বিবরণাদি হইতে এই সংবাদ অবগত হওয়া যায় যে, চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম প্রথমাবস্থাতে স্বাধীন রাজা (প্রতাপ রুদ্র), ভূইয়া রাজগণ [বীর হাম্বির ও শিখরভূমির (বর্ত্তমান পঞ্চকোট)—রাজা হরিনারায়ণ], প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা (রামানন্দ রায়), বড় বড় মন্ত্রী (রূপ-সনাতন, "সহস্র ঘোড়া যার আগে পিছে দৌড়ে, বাইশ লক্ষ স্বর্ণ পোতা থাকিল সে গৌড়ে") ৮ জমিদার পুত্র (নরোত্তম দত্ত ও রঘুনাথ দাস), ধনী (উদ্ধরণ দত্ত), কৃষ্ণদাস নামে এক রাজপুত জমিদারের ছেলে ইত্যাদি ভক্ত হইয়াছিলেন। এই ধর্ম্ম প্রথমে অভিজাতদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং বাংলার মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের তথাকথিত উচ্চ জাতিদের মধ্যেই ইহা গৃহীত হয়।

বিমানবাবু প্রথমযুগের ভক্তদের মধ্যে জাতির যে-তালিকা দিয়াছেন তন্মধ্যে বঙ্গীয় হিন্দুদের তালিকার মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় ভক্তদের সংখ্যা হইতেছে—ব্রাহ্মণ ২৩৯ জন, কায়স্থ ২৯, বৈদ্য ৩৭, সুবর্ণ বণিক ১ জন।৯ এতদ্দ্বারা ইহা দৃষ্ট হয় যে, এই ধর্ম্ম প্রথমযুগে তথাকথিত নিম্নজাতিদের মধ্যে প্রবেশ করে নাই। ব্রাহ্মণদের দ্বারা মুখ্যতঃ ইহা প্রচারিত হইয়াছিল। নিপীড়িত জাতিদের মধ্যে একজন ভক্ত হইয়াছিলেন। অন্যপক্ষে তথাকথিত অভিজাত বা দরবারী শ্রেণীর ভক্তদের মধ্যে কায়স্থের সংখ্যা অতি কম। ইহার কারণ কি? কেনই বা কায়স্থেরা এই ধর্ম্মে আকৃষ্ট হয় নাই, এবং কি-কারণেই বা বেশীরভাগ কায়স্থেরা, বেশীরভাগ বৈদ্যেরা এই ধর্ম্মকে আজ পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে? এই সমস্যার ব্যাখ্যা সামাজিক ও জাতীয় জীবনে নূতন আলোকসম্পাত করিবে।

(৮) জয়ানন্দ—"চৈতন্য মঙ্গল", বিজয় খণ্ড—পৃঃ ১৩৬

(৯) শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান—পৃঃ ৬০৯।

৮

ধর্ম্মবিষয়ক সংবাদ

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রথম যুগের বৈষ্ণব-নেতারা ভক্তদের অন্য দেবদেবীর পূজাদি করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। দীনেশবাবু ইহাকে অন্যদারতা বলিয়াছেন।১ কিন্তু "হরিভক্তি বিলাস" নামক বৈষ্ণবস্মৃতি২ এই নিষেধটি প্রাচীন বৈষ্ণবপুরাণাদি হইতে উদ্ধৃত করিয়া নিজের মধ্যে চালাইয়াছেন। যেমন স্কন্দপুরাণ বলিতেছে, "অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়।" পদ্মপুরাণ বলিতেছে, "বুদ্ধিমান বৈষ্ণব অন্য দেবতার নৈবেদ্য বা পানীয় গ্রহণ, স্পর্শ বা ভক্ষণ করিবে না।" নৃসিংহ পুরাণে বিষ্ণু-ধর্ম্মোত্তরে বলা হইয়াছে, "যে-ব্যক্তি অন্য দেবতার প্রসাদ ভক্ষণ না করে, কেশব তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন।" অন্যপক্ষে নারদ-পঞ্চরাত্রে বলা হইয়াছে, "বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজনও সংসারমুক্তির অপর একটি প্রধান কারণ।"

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের মধ্যে পারস্পরিক উচ্ছিষ্ট খাবার প্রথা আছে। ভুঁইমালী জাতীয় ঝড়ু ঠাকুরের উচ্ছিষ্ট সপ্তগ্রামের রাজার ভাই ভক্ষণ করিতেন। চৈতন্যপ্রভু এতে আপত্তি করেন নাই। পুরীতে রঘুনাথদাস গোস্বামী সাধক অবস্থায় পাত্রস্থ উচ্ছিষ্ট কুড়াইয়া খাইতেন। চৈতন্যদেব তাহাতেও আপত্তি করেন নাই। জয়ানন্দ বলিয়াছেন যে, চৈতন্য-দেব নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, "বৈষ্ণবের অন্নদোষ মনে নাহি দ্বিধা"। কিন্তু পশ্চিমের অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা এইজন্যই বাঙ্গালী বৈষ্ণবদের

(১) "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"—পৃঃ ৩০১।

(২) শ্রীরাধনাথ কাবাসী সঙ্কলিত—"শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার" ১ম খণ্ড।

অতি ঘৃণা করেন। বৃন্দাবনে লেখকের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়কে একজন পশ্চিমা বৈষ্ণব বাবাজী (ইনি একটি সম্প্রদায়ের নেতা) বলিয়াছিলেন, "বাবুজী, বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরা পরের ঝুটা খায় কেন ?৩ এই বিষয়ে লেখক একটি প্রবীণ ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি পরলোকগত চরণদাস বাবাজীর একজন শিষ্য। তিনি বলিলেন, "আমার গুরুই এইটি প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।" আমরা জনকতক আপত্তি করাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "তোমাদের ভক্তি নেই!" কিন্তু দৃষ্ট হয় যে, এই বিধান প্রথম হইতেই ছিল, যদিচ ইহার সর্ব্বজনীনতার কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু এই অভ্যাস দ্বারা যে একটা কুৎসিৎ প্রবৃত্তির সৃষ্টি হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই। লেখক একবার পশ্চিমবঙ্গের নবশায়কজাতীয় বৈষ্ণববংশীয় একটি যুবককে অবৈষ্ণব ও বিভিন্নজাতির উচ্ছিষ্ট খাইতে দেখেন। ইহার ফলে সকলেই হৈ-হৈ করিযা তাহাকে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করিতে আরম্ভ করেন। লেখক যখন অন্য সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে, এই লোকটি উচ্চজাতীয় এবং বোধহয় দীনতা-সুলভ মনোবৃত্তি দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই এই কর্ম্ম করিতেছেন, তখন লেখকের এই যুক্তি কেহই মানে নাই। এই ঘটনাটি ১৯০৮ সালে ভাগলপুর জেলে ঘটিয়াছিল। ধর্ম্মাচরণ বিষয়ে আর কতকগুলি বিধান প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যেমন নিরামিষ-ভোজন। লোকনাথ ঠাকুর নরোত্তম দাসকে নিম্নলিখিত সর্ত্তে শিষ্য করেন :—

"তবে কহে বিষয়েতে বৈরাগী হইবা,
অনদ্বাহ উষ্ণ চালু মৎস্য না খাইবা" ।৪

দীক্ষামন্ত্রগ্রহণের নিয়ম হইতেছে এই যে, মৎস্য মাংস ভক্ষণ করিতে পারিবে না, কিন্তু "রোগাদির জন্য কখনও মাংসভোজনের আবশ্যক

(৩) শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত—"সাধু চতুষ্টয়" দ্রষ্টব্য।

(৪) শ্রীমৎ মনোহর দাস—"অনুরাগবল্লী" ৪র্থ মঞ্জুরী পৃঃ ৬৬।

হইলেও কচ্ছপ ও শূকর মাংস কদাচ ভক্ষণ করিবেনা"।৫ আবার অন্যত্র বলা হইয়াছে যে, মহারোগী শশক ও শূকর মাংস ছাড়া অন্য মাংস খাইতে পারে।৬ "হরিভক্তিবিলাসের" অনুজ্ঞানুযায়ী বৈষ্ণবের নিকট তুলসী গাছ পবিত্র। প্রাচীন বৈষ্ণবদের কাছেও তুলসী গাছ তদ্রূপই ছিল। ইহাকে প্রাচীন Totem-এর চিহ্নস্বরূপ মনে করা যাইতে পারে। মহেনজোদাড়োতে অশ্বত্থ বৃক্ষ এবং বিভিন্ন জন্তুপূজার চিহ্ন পাওয়া যায়। বেদেও অশ্বত্থবৃক্ষ-মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। কাজেই কোন একটি বিশিষ্ট বৃক্ষের বা লতার পবিত্রতাকে উপরোক্ত বিশ্বাসের ফলস্বরূপ বলিয়াই গণ্য করা বিধেয়। "হরিভক্তি বিলাসে" "শালগ্রাম শিলার" পূজার ব্যবস্থা আছে সকল বর্ণের :—'স্ত্রী হউক বা শূদ্র হউক, কিম্বা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়াদি হউক শালগ্রাম পূজা করিলে নিত্যধাম বৈকুণ্ঠ-লাভ করিবে'। অতএব স্ত্রী ও শূদ্রাদির শালগ্রাম পূজা-বিষয়ক যে-সমস্ত নিষেধবাক্য স্পষ্ট শ্রবণ করা যায় তৎসম্পর্কে তত্ত্বদর্শিগণ বলিয়াছেন, "ওই সকল নিষেধবচন অ-বৈষ্ণবের পক্ষে, বিষ্ণুভক্তগণের পক্ষে নয়"।৭ কথিত আছে, শ্রীচৈতন্য তাঁহার পূজিত শালগ্রাম শিলাকে রঘুনাথদাস গোস্বামীকে পূজার জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল কথা উঠিয়াছে যে, 'হরিভক্তিবিলাসের' এই অনুজ্ঞা হিন্দুশাস্ত্রসম্মত নয়। চৈতন্যদেবের ব্যক্তি-গত দৃষ্টান্তকেই ধর্ম্মসংক্রান্ত বিধান বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। আজকাল কিন্তু শূদ্র-বৈষ্ণব শালগ্রামশিলা নিজে পূজা করিতে পারেন না। অথচ দেখা যায় যে, অন্যান্যধর্ম্মে অনেকস্থলেই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের ব্যক্তিগত আচরণ ধর্ম্মগত অনুষ্ঠান বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। এইজন্য "হরিভক্তিবিলাসের" অনুজ্ঞা অযৌক্তিক নহে।

(৫) শ্রীরাধানাথ কাবাসী—"শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার" ১ম খণ্ড, পৃঃ২২২।

(৬) শ্রীশ্রীরাধানাথ কাবাসী—"শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার" কার্ত্তিক ব্রত পৃঃ ২৯৪—২৯৫।

(৭) শ্রীরাধানাথ কাবাসী—"শ্রীশ্রীবৃহদ্ভক্তিতত্ত্বসার" ১ম খণ্ড, পৃঃ২৭৭।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রথমযুগে সনাতনী ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সর্ব্ববিষয়েই বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিল। হরিভক্তিবিলাস হিন্দুর জীবনে সমস্ত বিষয়েই নূতন ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছে। এইযুগের সনাতনীদের তরফ হইতে লিখিত রঘুনন্দনের "অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের" সহিত তুলনামূলকভাবে পাঠ করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। বৈষ্ণবদের এই স্মৃতি সনাতনীদের স্মৃতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। কথিত আছে, চৈতন্যদেবের অনুজ্ঞা অনুসারেই ইহা লিখিত হয়। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াই চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম আসরে নামিয়াছিল। নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনায় আছে,—

"তীর্থজল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছেন পুরাণে
সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন.
বৈষ্ণবের পাদোদক সম নহে সেই সব
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ"।

আবার দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনায় আছে, "জাতির বিচার নাই বৈষ্ণব বর্ণনে, দেবতা, অসুর, ঋষি সকলেই সমানে"। পুনশ্চ, দীন কৃষ্ণ-দাসের পদাবলীতে আছে, "ব্রাহ্মণে যবনে মিলি, করাইল কোলাকুলি, পরতেকে চাহ একবার"।৮ আবার নরহরি দাস বলিতেছেন, "অনুপম গোরা অবতার, নবধা ভকতি বহে বিস্তারিয়া সব দেশে, না করিল জাতির বিচার"।৯ পুনঃ শেখরদাস বলিতেছেন, "বিষয়েই যবন যত, তারা হইল উন্মত, না হইল পড়ুয়া অধম"১০। "সুরধনী যাইঞা ভাসাইব কুলক্রিয়া, তবে ভজিব সে গোরা কুলমণি"।১১। এইসব বিবরণ হইতে বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রথমযুগের spirit বুঝা যায়।

(৮) "শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী"—পৃঃ ১০।
(৯) ঐ —পৃঃ ২৮।
(১০) ঐ —পৃঃ ২৮।
(১১) ঐ —পৃঃ ১০৮।

৯

বৈষ্ণব ধর্ম্মে ইসলামের প্রভাব

অনেকদিন হইতেই পণ্ডিত মহলে বিচার-বিতর্ক চলিয়াছে, যে ইসলামের অন্তর্গত সুফীমতের ভিতর হিন্দুর বেদান্তদর্শনের প্রভাব আছে। এমন কি, সুফীদের অতীন্দ্রিয়বাদের planes-এর সহিত হিন্দুদের যোগ-শাস্ত্রের আসনের মিল আছে।১ পরলোকগত মৌলভী ওয়াহেদ হোসেন সাহেব এই অনুষ্ঠানটিকে parallelism in historyর একটি দৃষ্টান্ত বলিয়া মনে করেন।২ পক্ষান্তরে ইহাও শুনা যায় যে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে সিন্ধুদেশবাসী একজন মুসলমানের নিকট হইতে মুসলমান ধর্ম্মীয় এক ইরাণী যোগপ্রদ্ধতি শিক্ষা করেন।(৩) তাঁহার দ্বারাই পশ্চিম এসিয়াতে এই পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয়। ইহা Diffusion of Culture-এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এখন কথা হইতেছে, বৈষ্ণবধর্ম্মের উপর ইসলাম তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল কিনা।

---

(১) Wahed Hossain—"Mysticism in Islam" in University Extension Lectures on sufi-ism, p. 27.

(২) ইহা তিনি লেখককে ব্যক্তিগতভাবে বলিয়াছিলেন। তাঁহার উপরোক্ত বক্তৃতায় তিনি বলেন "the currents of their thought have flowed in the same channel.

(৩) আবদুল কাদের বলেন, "মাদার তৈফুর বস্তামির শিষ্য...বস্তাম দেশের একজন সুফি বিশ্বখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন--তিনি বায়জিদ্ বস্তামি। বায়জিদ্ একজন জুরষ্ট্রিয়ানের পৌত্র। তাঁহার গুরু কুর্দ্দদেশের একজন সুফী, তিনি সিন্ধু দেশের আবু আলীর

নিকট হইতে "ফানাহ্" শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। আবু আলী ভারতবর্ষীয় শ্বাস-সাধনা (Indian practices of watching the breaths) আয়ত্ত করিয়াছিলেন। অনুমান করা যাইতে পারে, তৈফুর বস্তামি বায়জিদ্ গুরুর বা ভারতীয় কোন সাধকের নিকট হইতে স্বয়ং এই দমের সাধনা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ('বাঙ্গলার পল্লী গানে বৌদ্ধসাধনা ও ইসলাম'' বিচিত্রা, ১৩৩৫)।

John A. Subhan, B. D. "Suffism, its saints and Shrines. (1938)" নামক পুস্তকে বলিতেছেন, "...Abu Yazid-ul Bistami or Bayazid as he is called, one of the earliest Sufis of the pantheistic school.. He was of Persian ancestry...His grandfather, Sharwasan was a Zoroastrian, and his master in Sufism was Abu Ali of Sind. Abu Yazid first propounded the doctrine of Fana, annihilation, in its negative aspect and in his teaching Sufism became practically identified with Pantheism." পুনঃ ইনি বলিতেছেন--"Here we return to the older ideas of Fana or annihilation. How far was "Attar" (জন্ম ১১১৯ খৃঃ) indebted to his stay in Hindusthan for this picture of Maya and release? (p. 35)। তৎপর ইনিই আবার বলিতেছেন, সুফিদের সাধনার একটি অঙ্গ হইতেছে 'ধিক্র' (Dhikr), ইহা হইতেছে, "remembering God, through particular exercises of the breath" (p. 99). পুনঃ ইনি M. Titus-এর পুস্তক (Indian Islam) হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে, ইসলাম ও হিন্দুধর্ম্মের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ অন্ততঃ এগারটি হিন্দুসম্প্রদায় উদ্ভূত হয়। ইহার মধ্যে 'পিরজাদা', 'ছাজ্জু', 'হুসেনী ব্রাহ্মণ', 'সামি' সম্প্রদায়গুলিতে হিন্দু ও মুসলমান বিশ্বাস এবং আচার সুস্পষ্টভাবে দৃষ্ট হয় (পৃঃ ১৭২-১৭৭)।

আবার আবুল আলি...অলমারি নামক বিখ্যাত মুসলমান কবি ও পণ্ডিত আলেপ্পোতে জন্মগ্রহণ (৯৭৩ খৃঃ) করেন। ইনি বোগদাদে ভারতীয় মত ও আচার শিক্ষা করেন। এই মত ও আচার জৈনধর্ম্ম সংক্রান্ত বলিয়াই অনুমিত হয়। ইনি খাদ্যের জন্য মাংস খাওয়া অন্যায় মনে করিতেন এবং সেই সঙ্গে ডিম্ব, দুগ্ধ এবং মধু আহার করিতেন না। ইনি ভারতীয় প্রথানুযায়ী মৃতদেহকে দগ্ধ করা সমর্থন করিতেন (Encyclopædia of Religion and Ethics, vol. 8, Pp. 222-224).

ভারতে আসিয়া ভারতীয়দের নানা প্রকারের অলৌকিক প্রক্রিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা বা শিক্ষা করার বিষয়ে বিখ্যাত মনসুর অল্-হল্লাজের নাম প্রসিদ্ধ। ইঁহার পিতামহ একজন জরতুষ্ট্রীয় পুরোহিত (Magai) ছিলেন। ইনি ভারতে "ম্যাজিক্" শিক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন। ইনি শিষ্যদের বলিতেন যে, তিনি শরীর ফুলাইয়া ঘরজোড়া বড় করিতে পারিতেন, শূন্যে উঠিতে পারিতেন এবং একজনকে ইহাও বলিয়াছিলেন যে তিনি ভারতে Rope-trick দেখিবার জন্য গিয়াছিলেন। ইনি নাস্তিকতা অপরাধে খলিফা কর্ত্তৃক ৯২২ খৃঃ নিহত হন। "The same heresies Incarnation, Return or Re-incarnation, and Authropomorphism are charged against "al-Hallaj," E. G. Brown, "A Literary History of Persia", Pp. 431-435.

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে অনুমান করিতে পারা যায় যে, পারসিক সুফীরা ইসলামের প্রথম যুগেই ভারতীয় হটযোগ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং অনেকে যে ভারতীয় ধর্ম্মবিশ্বাস দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন তাহাতেও আর সন্দেহের অবকাশ নাই। এই ঐতিহাসিক ঘটনা সমূহের সমাবেশ দ্বারা ইহা বোধগম্য হয় যে, সুফী ও হিন্দু যোগ প্রক্রিয়ার সাদৃশ্য parallelism in history না হইয়া Diffusion of culture দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে। সুফীরাই এই সকল বিষয়ে হিন্দুদের নিকট ঋণী।

পরলোকগত ওয়াহেদ হোসেন আরও বলেন "Now how to account for the resemblance of ideas in the love-poem of the sufi and of the Vaishnavite sect?......It should be borne in mind that the Vaishnavite order founded by Chaitanya rose into prominence long after the Muslim conquest; and its literature was greatly developed when suffism had spread all over the country. The assimilation of those ideas was the inevitable consequence of the literary discussions, mutual interchange of views, and the general study of the Persian literature. It is no wonder then that Suffism has excercised a preponderating influence over the mind of the Vaishnavite poets and impressed its mark on their literature." p. 47.

ঐতিহাসিক লেখকেরা বলেন, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইরাণের তাব্রিজ সহর হইতে দলে দলে সুফীমতাবলম্বী ভারতে আগমন করেন। এমন কি, ইহার পূর্ব্বেই দশম শতাব্দী হইতেই ইসলাম প্রচারকেরা এদেশে আসিতেছিলেন। "সেখ শুভোদয়া" অনুসারে সেখ জালালুদ্দিন তাব্রিজি লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় ছিলেন।৪ সেখ মৈনুদ্দিন চিষ্টি আজমীরে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং খ্রীঃ ১২৩৪ সালে পরলোকগমন করেন। ইঁহাদের সুফী মত হিন্দুদের আকৃষ্ট করে, এবং সুফীরাও দেশীয় ভাষায় রূপক গল্পের দ্বারা নিজেদের ধর্ম্মমত প্রকাশ করেন। জায়শীর 'পদ্মাবত' কাব্যই তাহার একটি প্রমাণ। অনেকে অনুমান করেন, এই প্রভাবের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ উত্তরভারতে "সন্ত" মতগুলি উদ্ভূত হয়। সুফীদের প্রেমের দ্বারা ঈশ্বর লাভ, আর বৈষ্ণবদেরও তদ্রূপ সাধনা—এই উভয় ধারণাই খুব কাছাকাছি। এইজন্য কোন্ ধর্ম্ম কাহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধানের বস্তু।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বেদান্তের মত সুফীদের প্রভাবান্বিত করে। কথিত আছে, মৌলানা রুমী বৈদান্তিক ভাবাপন্ন ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দরবেশগুলিকে "মৌলভি সম্প্রদায়" (Moulvi or Mevlevi Sect)৫ বলা হয়। ইহাদের মধ্যে দুইটি দলের নাম,—Howling Dervishes, and Dancing Dervishes. এই সব দরবেশের আড্ডা ছিল Constantinople. কামাল পাশা ইহাদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন। ইঁহাদের গুপ্ত ধর্ম্মপুস্তক সকল আছে। জার্ম্মাণ পণ্ডিত ফন্‌ক্রেমার বলেন, এই প্রকারের একটি পুস্তিকা তাঁহার হস্তগত হয়। তিনি ইহা অনুবাদ

(৪) ডাঃ সুকুমার সেন সেখ তাব্রিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান। কিন্তু লেখক এই বিষয়ে মৌলানা মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন,—উত্তরে তিনি বলেন যে, এই সেখ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

(৫) T. W. Arnold—"Preaching of Islam" p. 228.

করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহা "বেদান্তসার" পুস্তকের সহিত হুবহু মিলে।৬ এই সুফীদের মধ্যে দরবেশ, আউলিয়া প্রভৃতি শাখা আছে। দিল্লীতে নিজামুদ্দিন আউলিয়ার দরগা আছে। এক্ষণে অনুসন্ধানের বিষয় বস্তু হইতেছে, বাংলার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার কোন প্রভাব আসিয়াছিল কিনা।

চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে, অদ্বৈতাচার্য্য কোন এক ভক্তের মারফত সাঙ্কেতিক বাক্য দ্বারা চৈতন্যকে কথা পাঠাইয়াছিলেন, "বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল। বাউলকে কহিও কালে নাহিক আউল। বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল। বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।"৭ এইস্থলে অদ্বৈত নিজেকে আউল বলিতেছেন। আবার "আউলিয়া" উপাধিধারী একজন ভক্ত ছিলেন, আউলিয়া চৈতন্যদাস।৮ গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা বাহু তুলিয়া নৃত্য করেন এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাটিতে পড়িয়া 'দশা' প্রাপ্ত হন। লেখক Constantinople-এ Dancing Dervishদের এই প্রকারের নৃত্য করিতে এবং দশা প্রাপ্ত হইতে দেখিয়াছেন। এইরূপ নিকট সাদৃশ্য দেখিয়া তিনি চমকিয়া উঠেন। এক্ষণে বিচার্য্য, কোন্ সম্প্রদায় কাহার নিকট হইতে এই প্রণালীটি গ্রহণ করিয়াছে। মৌলানা রুমির সম্প্রদায় প্রথমে উদ্ভূত হয় এবং আউলিয়া শাখা তাহারই অন্তর্গত। রুমী খৃঃ ১২৭৩ অব্দে কোনিয়ে সহরে মারা যান।৯ ইহার বহু পরে চৈতন্যের সম্প্রদায় বিবর্ত্তিত হয়।

---

(৬) Van Kremer—"Islamische streifzuege."

(৭) শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"—বসুমতী সঙ্কলন, পৃঃ ৩৭০, অন্য সংস্করণে পাঠান্তর আছে—"বাউলকে কহিয় লোকে হইল বাউল। বাউলকে কহিয় কাজে নাহিক আউল। বাউলকে কহিয় ইহা কহিয়াছে বাউল॥"

(৮) "গৌরপদতরঙ্গিণী" দ্রষ্টব্য। আউল মনোহর দাসের দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৭০—১৭১।

(৯) Arnold, "Preaching of Islam," p. 228.

কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রথমোক্তদের নিকট হইতেই শেষোক্তরা ইহা গ্রহণ করিয়াছে। প্রাচীন বৈষ্ণবেরা যে ওই প্রকারের নৃত্য করিতেন তাহার প্রমাণ কই? এতদ্ব্যতীত বঙ্গীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে আউল, বাউল, সাঁই, গোঁসাই, দরবেশ প্রভৃতি শাখা আছে। ইঁহারা চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া নিজেদের পরিচয় প্রদান করেন। ইঁহারা দেহতত্ত্ব বিষয়ক গান করেন এবং হিন্দুর আচার ব্যবহারে নিষ্ঠাবান নহেন। ইঁহাদের কিন্তু হালের বৈষ্ণব নেতারা চৈতন্য সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া অস্বীকার করেন। লেখককে কোন বৈষ্ণবসাহিত্যিক বলিয়াছিলেন যে, ইঁহারা চৈতন্যের নামের দোহাই দিয়া নিজেদের চৈতন্য সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া জাহির করেন বটে, কিন্তু ইঁহারা চৈতন্য সম্প্রদায়ভুক্ত নহেন।[১০] বিমান-বাবু বলিতেছেন,—"সহজিয়া, সাঁই, বাউল ও দরবেশগণ অনেক পুঁথি লিখিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামে চালাইয়া দিয়াছেন"……দরবেশদের একখানি বইয়ের নাম 'বীরভদ্রের শিক্ষামূল কড়চা'……উহার গ্রন্থকার-রূপে কৃষ্ণদাস কবিরাজের নাম ছাপানো হইয়াছে। উহাতে দেখা যায়, নিত্যানন্দ বীরভদ্রকে বলিতেছেন,—

"শীঘ্র করি যাহ তুমি মদিনা সহরে।
যথায় আছেন বিবি হজরতের ঘরে॥
তথায় যাই শিক্ষা লহ মাধব বিবির সনে
তাঁহার শরীরে প্রভু আছেন বর্ত্তমানে
মাধব বিবি বিনে তোর শিক্ষা দিতে নাই
তাঁহার শরীরে আছেন চৈতন্য গোঁসাই'॥

তৎপরে বীরভদ্র মদিনায় গিয়া মাধববিবিকে স্তব করিলেন,—

(১০) নবদ্বীপের এক গোস্বামী লেখককে বলিয়াছেন যে ইঁহারা যখন চৈতন্যের মন্দিরে আসিয়া ঠাকুর দর্শন করেন এবং প্রসাদ ভক্ষণ করেন তখন তাহাদের চৈতন্যশিষ্য বলিব না কেন?

"মনে মনে মাধব বিবি ভাবিতে লাগিল
বীরভদ্রে মনে করি উলঙ্গ হইল।
*　　*　　*　　*
কে কোথায় আছ দেহে কর দরশন
গোপ গোপী সাথে দেখ নন্দের নন্দন॥"১১

এইস্থলে বক্তব্য, এক বাবা নানক ব্যতীত মধ্যযুগের কোন হিন্দু ধর্ম্মপ্রচারক ভারতের বাহিরে গিয়াছিলেন কিনা, তাহার কোন জনশ্রুতি বা কোন প্রমাণ নাই। এই পুস্তিকা পড়িলে মনে হয়, ইহা আজগুবি ও অপ্রামাণিক গল্প মাত্র। কিন্তু এক্ষণে ইহা ঐতিহাসিক তত্ত্বের বিচার্য্যস্থল যে, এইসব সম্প্রদায়গুলি চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত আন্দোলনের ফলস্বরূপ কিনা? যেমন শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তিত দশনামী সম্প্রদায় সমূহ হইতে বর্ত্তমানে নানা সম্প্রদায় সমুদ্ভূত হইয়াছে, যাহাদের সহিত আসলের কোন সম্পর্কই নাই, তদ্রূপ শিষ্য-প্রশিষ্যের ধারারূপে এই সব সম্প্রদায়গুলি চৈতন্যধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত হওয়া আশ্চর্য্যজনক নহে। এখন মূলতত্ত্বে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাক্। শ্রীযুক্ত বৈদ্যের মতে (১২) মুসলমান আক্রমণের পর সন্ত্রস্ত হিন্দুসমাজ আত্মরক্ষার জন্য একটি পাঁচীল তুলিয়াছিল। তাহা হইতেছে নব-বৈষ্ণবধর্ম্মের আন্দোলন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ভারতের সর্ব্বত্রই একটি নূতন ধর্ম্মান্দোলন প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ হইতেই এই উৎসের সৃষ্টি হয়। রামানন্দ এই স্রোত উত্তরে নিয়া আসেন। এই আন্দোলন দেশের অবশিষ্ট বৌদ্ধদের স্বীয় কুক্ষিগত করিবার জন্য তাহাদের নিকট হইতে অহিংসা-নীতি গ্রহণ করে এবং মুসলমানদের প্রতিরোধ করিবার জন্য

(১১) "শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান"—পৃঃ ৩০৯॥

(১২) "History of Mediæval Hindu India."

তাহাদেরই নিকট হইতে মানব মধ্যে ভ্রাতৃভাব ও সগুণ ভগবানের উপাসনার নীতি গ্রহণ করে। এই উভয়দলের নীতি গ্রহণ করিয়া মধ্যযুগের ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারক সম্প্রদায়গুলি উদ্ভূত হয়। ইহার উপর ইসলামের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।১৩ উত্তরে এই নূতন আন্দোলনের একটি লক্ষণ—মুসলমানদিগকেও ইহা স্বীয় সম্প্রদায়-ভুক্ত করিয়া লইয়াছে, এবং আচাণ্ডালে ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিয়াছে। অনেক মুসলমান যে বৈষ্ণব হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যায়। শতাধিক মুসলমান-বৈষ্ণব কবির পদাবলী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে নাসির মামুদ, সৈয়দ মুর্ত্তাজা, সালবেগ প্রভৃতির১৪ নাম উল্লেখযোগ্য। সাহ আকবর নামাঙ্কিত একটি হিন্দি পদাবলীও আবিষ্কৃত হইয়াছে। অনেকে ইহাকে খোদ বাদশাহ আকবর কর্ত্তৃক বিরচিত বলিয়া মনে করেন। শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী মহাশয় লেখককে বলিয়াছেন যে, উড়িষ্যায় একস্থানে "বৈষ্ণব পাঠান" পাড়া আছে।

অন্যপক্ষে মুসলমান একদল ফকিরের সহিত বৈষ্ণব আউল বাউলদের মতের সহিত বিশেষ প্রভেদ নাই। নবদ্বীপ জেলার কোন এক জায়গায় এক ফকিরের সঙ্গে লেখকের আলাপ হয়। তিনি বলিয়াছিলেন যে, বৈষ্ণব বাউলরা তাঁহাদের সহিত আহার করেন। তাঁহার মত সম্বন্ধে তিনি বলেন, যে-গুরুর রহমে (কৃপায়) আল্লার দর্শন পাইয়াছি সেই গুরু ব্যতীত আর কাহাকেও মানি না। ইঁহার মুখ হইতে সেই প্রাচীন সহজযানী স্বরুহপাদের১৫ ধ্বনি নিঃসৃত হইল। কুমিল্লায়

(১৩) Archer ও অন্যান্য পাদ্রীরা বলেন, দক্ষিণ ভারতের হিন্দু সংস্কারকগণ খৃষ্টানদের নিকট হইতেই এই প্রেরণা পাইয়াছিলেন।

(১৪) "শ্রীশ্রীপদকল্পতরু"—৫ম খণ্ড, সতীশ রায় সম্পাদিত, পৃঃ ১৩৪-২২৬।

(১৫) বৌদ্ধ "দোঁহা ও গাথা" দ্রষ্টব্য।

লেখক আর এক ফকিরের সহিত আলাপ করেন। তিনি জৌনপুরের কোন এক গুরুর শিষ্য। তাঁহার মত কিন্তু বৈদান্তিক মতের অনুরূপ বলিয়াই প্রতীত হইল। বৈষ্ণবদের নিকট: হইতে লেখক শুনিয়াছেন যে, খেতুড়ীর বাৎসরিক মহোৎসবে অনেক ফকিরের সমাগম হয়। এই সব দেখিয়া সহজেই অনুমিত হয় যে হিন্দু ও মুসলমান, এই উভয় সমাজের মধ্যে অন্তঃসলিলারূপে একই প্রেমধর্ম্মের ভাবধারা প্রবাহিত হইতেছে। লেখকের কোন কোন মুসলমান বন্ধু বলিয়াছেন যে, উভয় ধর্ম্মের সাধকেরা একই। এই কথারই প্রতিধ্বনি নজীর নামে একজন সুফীর উর্দ্দু কবিতাতে পাওয়া যায়,

"জুন্নার গলে ইয়া কি বগল্ বিচ্ মে কোরাঁ,
আসিক তো কলন্দর হইঁ ন হিন্দু ন মুসলমান।"

এই সব ঘটনা হইতে সহজেই অনুমান করিতে পারা যায় যে, চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মান্দোলনে ইসলামের প্রভাব কিঞ্চিৎ পড়িয়াছিল। এই বিষয়ে অনুসন্ধান হওয়া অত্যাবশ্যক।

চৈতন্যধর্ম্ম ও সহজিয়াবাদ

বর্ত্তমান যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণবনেতারা সহজিয়াবাদের সহিত সম্বন্ধ অস্বীকার করেন বলিয়াই মনে হয়। পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণব সাহিত্যিকটি লেখককে বলিয়াছেন, তাঁহার হস্তে অনেক সহজিয়া পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আসিয়াছে। কিন্তু সেগুলি এত অশ্লীল যে, তাহা মুদ্রিত করা যায় না। কিন্তু অনুসন্ধানকারীরা বলেন যে, সহজিয়াবাদের পরকীয়াতত্ত্ব বৈষ্ণব-ধর্ম্মতত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।১৬ ইতিপূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে,

(১৬) M. M. Bose—"The Post-Chaitanya Sahajia Cult of Bengal", Page 21..

নিত্যানন্দ "নেড়ানেড়ীদের" চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন। চৈতন্যধর্ম্মের উদয়ের পর হইতে বৌদ্ধদের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। ৺শাস্ত্রী বলেন১৭ যে, পূর্ব্বে বৌদ্ধ মধ্যবিত্ত-শ্রেণীর নিম্নস্তরে এবং নিম্নশ্রেণীর সনাতনপন্থীদের (Brahmanists) মধ্যে সহজিয়া ধর্ম্ম প্রচারিত ছিল। আজ সহজিয়া বা সহজযান সম্প্রদায় গেল কোথায়? তাঁহারা, হয় বৈষ্ণব, না হয় মুসলমান হইয়াছেন। শাস্ত্রীজী বলেন,১৮ বৈষ্ণবদের "গুরুভজার" ভাবটি (নেপালে বৌদ্ধ গুরুভজাদের "গুভাজু" বলা হয় এবং হিন্দু দেবতা ভজাদের "দেবভাজু" বলা হয়) বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে গৃহীত।

নগেনবাবু বলিয়াছেন যে, উড়িস্যার বৌদ্ধরা সনাতন গোস্বামীর শিষ্য হন এবং নিজেদের বৌদ্ধমতকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম গ্রহণ করেন।১৯ নগেনবাবু দেখাইয়াছেন যে, অচ্যুতানন্দদাস, বলরামদাস, চৈতন্যদাস প্রভৃতি উড়িস্যার বৈষ্ণব-কবিরা বৈষ্ণব আবরণে বৌদ্ধধর্ম্মেরই গান গাহিয়াছেন। যশোবন্তদাসের 'শূন্যসংহিতা,' চৈতন্যদাসের 'নির্গুণ-মাহাত্ম্য', বলরামদাসের 'বিরাট গীতা' বৌদ্ধ-শূন্যবাদেরই কথা বলিয়াছে —"শুন্যার ব্রহ্মাসিনা আহি। সেঠারে নাম থিবরহি"। নগেনবাবু বলেন, ইহা মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের শূন্যবাদের প্রতিধ্বনি মাত্র। আবার ইঁহাদের "সারস্বত গীতাতেও" তাহাই বলা হইয়াছে। জগন্নাথ দাসের "তুলা-ভিনা" পুস্তকে (পৃঃ ২০) বলা হইয়াছে, "সকল মন্ত্র তীর্থ-জ্ঞান, রহিল শূন্য এ প্রমাণ।" নগেনবাবু বলিয়াছেন, ইঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ ও বৈষ্ণবদের শ্রীকৃষ্ণ এক নয়; বরং ইহা বৌদ্ধদের 'অনাকার শূন্য-

(১৭-১৮) N. N. Vasu—Modern Budhism and its followers in Orissa—Introduction of H. P. Shastri, PP—13 & 25.

(১৯) N. N. Vasu—Modern Budhism and its followers in Orissa —Introduction of H. P. Shastri, PP. 37-135.

পুরুষ'।২০ নগেনবাবু আরও বলেন যে, সর্ব্বপ্রকারের বৌদ্ধদের প্রতি প্রতাপরুদ্রের নির্য্যাতন হইতে বাঁচিবার জন্য বেশীর ভাগ বৌদ্ধ চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন, অচ্যুতানন্দের 'শূন্য-সংহিতাতে' ইহার ইঙ্গিত আছে। তাহাতে তিনি বলিতেছেন, দণ্ডকারণ্য ভ্রমণকালে ভগবান বুদ্ধ তাহার নিকট আবির্ভূত হন এবং অচ্যুতকে বলেন, 'কলিযুগে আবার আমি বুদ্ধরূপে প্রকাশ পাইয়াছি, কিন্তু এই কলিযুগে তোমার বৌদ্ধ মনোভাবকে গোপন করিতে হইবে। তোমরা পাঁচজন আমার পাঁচটি আত্মা। তুমি বুদ্ধ, আদিশক্তি (ধর্ম্মের) এবং সঙ্ঘের শরণাপন্ন হও। হে অচ্যুত, বলরাম প্রভৃতি, তোমরা যাও এবং আমি যাহা বলিযাছি তাহা প্রকাশ কর।' এইজন্য অচ্যুত "শূন্যসংহিতা"তে বলিয়াছেন যে, কলিযুগে বুদ্ধের শিষ্যেরা আত্মগোপন করিবেন। নগেনবাবু বলেন যে, এতদ্দ্বারা ইহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হয় যে, উৎকলে যে পাঁচজন কবি নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাতির পাইতেছিলেন, তাঁহারা আসলে ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীতে গুপ্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পাঁচটি স্তম্ভ ২১। অবশেষে নগেনবাবু বলেন যে উড়িষ্যায় নানারূপে এখনও বৌদ্ধধর্ম্ম বিরাজ করিতেছে। ইঁহাদের 'যশোমতি মালিকা' নামক ধর্ম্মগ্রন্থেই বলা হইয়াছে "কলিযুগে ভক্তেরা প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছেন, যদিও এখনও বুদ্ধ অবতারের দর্শন পাননি ২২।" উড়িষ্যার যখন এই অবস্থা তখন বাঙ্গলার বিষয়ে কি বলা যাইতে পারে? কর্ত্তাভজাদের ধর্ম্মমত শুনিয়া মনে হয় যে ইহারা গুরুভজা সহজযানীদের রূপান্তর মাত্র। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন সহজিয়াদের প্রভাব চণ্ডীদাসের সময় হইতেই বৈষ্ণবমতের উপর বিস্তার

(২০) N. N. Vasu—Modern Budhism and its followers in Orissa—P. 55।

(২১) ঐ-পৃঃ ১২৯।

(২২) ঐ—পৃঃ ১৮১।

করিয়াছিল। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে-সব বৌ মুসলমান হন নাই তাঁহারা বৈষ্ণবধর্ম্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্ম-রক্ষা করিয়াছেন ২৩। এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আরও অনুসন্ধান প্রয়োজন।

১০

বৈষ্ণবধর্ম্মের উদারতা

বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রথমযুগের সাহিত্য ও তৎপ্রসূত কর্ম্মকাণ্ড হইতে ইহা প্রতীত হয় যে, সনাতনপন্থায় ধর্ম্ম হইতে ইহা আপেক্ষিকভাবে কিঞ্চিৎ উদার। চৈতন্য রামানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। ইহা নাকি ব্রাহ্মণদের কাছে ভাল লাগে নাই! তাঁহারা বলিয়াছিলেন,

"এই তো সন্ন্যাসীর তেজ দেখি ব্রহ্মসম
শূদ্র আলিঙ্গিয়া কেন করেন ক্রন্দন।" (১)

পুনঃ "সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের করিতে গর্ব্বনাশ
নীচ শূদ্রের দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ।" (২)

তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "যতেক অস্পৃশ্য দুষ্ট যবন চণ্ডাল। স্ত্রী-

(২৩) লামা তারানাথ বলেন, (History of Budhism in India), তুর্কি-মুসলমানদের দ্বারা বঙ্গ-বিজয়ের পর গোরক্ষনাথ সম্প্রদায় (মহাযানীদের একটি শাখা) তার্থিকদের (অ বৌদ্ধ) সহিত মিশিয়া যাইতে থাকে। কারণ তাহারা প্রদর্শন করিত যে, এতদ্দ্বারা তাহারা তুর্কিদের হাত হইতে বাঁচিতে পারিবে। বোধ হয় ইহারাই কালে "যোগী" বা "নাথ" জাতিরূপে সনাতনপন্থায় সমাজে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

(১) "চৈতন্যচরিতামৃত"—মধ্য, ৪র্থ, পৃঃ ১৬।

(২) ঐ ঐ —অন্ত্য, ৫ম ৩৪।

শূদ্র আদিতে অধম রাখাল !! হেন ভক্তিযোগ দিমু এ-যুগে সবারে। সুর-মুনি সিদ্ধ যে নিমিত্ত কাম্য করে ॥"৩

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে (৩য় অঙ্ক) বলা হইয়াছে,—

"বিরাগ বলেন ম্লেচ্ছ নীচ যোনি হয়।

* * *

ভক্তি কহে···· কৃষ্ণের প্রসাদ কার অপেক্ষা না করে।"

আবার দেখা যায় যে, পুরীতে হরিদাসকে সার্ব্বভৌম নিম্নলিখিত শ্লোক উচ্চারণ করিয়া নমস্কার করিয়াছেন ঃ—

"কুলজাত্যানপেক্ষায় হরিদাসায় তে নমঃ।" (৪)

তথা, "দেখি সার্ব্বভৌম হরিদাস প্রতি কয়,
জাতি কুল বৃথা সব ইহা বুঝাইতে
ম্লেচ্ছ কুলে তুমি জন্ম লইলে ইচ্ছা মত।" (৫)

অভিরাম, রূপ, সনাতন প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, সনাতনী গোড়ামি ভাঙ্গিয়া চৈতন্যের দল উদার পন্থা অবলম্বন করতঃ আচণ্ডাল সকলকে আলিঙ্গন করিতেছিলেন। ভুঁইমালী ঝড়ু ঠাকুর সম্প্রদায়ের মধ্যে মাননীয় স্থান পাইতেন। ইহারই ফলে, সনাতনপন্থীয় প্রপীড়িত জাতিসমূহ দলে দলে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত হইতে লাগিল। এই সম্প্রদায় পতিত ও পতিতাদের আশ্রয় প্রদান করিতে লাগিলেন এবং তাহারা আজও আশ্রয় পায়। ফলে, "জাত বৈষ্ণব" বলিয়া একটি জাতির উদ্ভব হয়। কীর্ত্তনীয়াদের "সব অবিধি নদের বিধি"৬ সত্যই তাহা

(৩) চৈঃ ভা, অঃ ৪।১২২-১২৩।

(৪) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ২০৫ পৃঃ।

(৫) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক—১০ম অঙ্ক (বাংলা)।

(৬) দীনেশ সেন—"গোবিন্দদাসের কড়চা"—ভূমিকা পৃঃ ৬৪।

ছিল। সমাজ হিসাবে ইসলাম যেমন উদার, এবং বর্ত্তমানের Socialist ও Communistগণ যেরূপ উদার, চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় প্রথম যুগে তদ্রূপ উদার ছিলেন। ইহার ফলে, উপরোক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে বৃন্দাবন দাসকেও বৈষ্ণবসমাজে সম্মানিত হইতে দেখা যায়। এই উদারতাই সনাতনপন্থীয় প্রপীড়িত হিন্দুসমাজকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। তজ্জন্য আজ বাঙলায় বেশীর ভাগ হিন্দু চৈতন্যের সম্প্রদায়-ভুক্ত। কিন্তু আজ ব্রাহ্মণ্য-পৌরোহিত্যবাদ চৈতন্যের সম্প্রদায়কে আচ্ছন্ন করিয়াছে। তবুও সনাতনী ব্রাহ্মণশ্রেণী অপেক্ষা কোন কোন ক্ষেত্রে গোস্বামী ব্রাহ্মণেরা এখনও কিঞ্চিৎ উদার। তাঁহারা মন্ত্রশিষ্যা বেশ্যার বাড়ীতেও খাদ্য গ্রহণ করেন, এবং স্থান বিশেষে শূদ্র শিষ্যের হাতের পাককরা অন্নও গ্রহণ করেন বলে শুনা যায়। কিন্তু সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণেরা এসব কিছুই করেন না।)

বৈষ্ণবধর্ম্মে গণ-আন্দোলন

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, চৈতন্যের ধর্ম্ম প্রথমাবস্থায় উচ্চশ্রেণীয় লোকেদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, সমাজের অতি-নিম্নস্তরের লোকেরাও এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। যে-সব জাতিকে সনাতনপন্থী ব্রাহ্মণেরা অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্য বলিয়া আজও ঘৃণা করেন, সেখানে কিন্তু বৈষ্ণব ভক্তেরা গিয়া ধর্ম্মোপদেশ দান করেন। আজ যখন দেখা যায় যে, মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ও অন্যান্যজাতীয় লোক ছাড়া বেশীর ভাগ হিন্দু চৈতন্যের দলভুক্ত, তখন বুঝিতে হইবে যে, একটা mass flight to Vaishnavism, অর্থাৎ একসময়ে স্রোতের ন্যায় দলে দলে লোক বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ৺বিপিনচন্দ্র পাল বলিয়াছেন,

"This general Vaishnava upheaval created a continental mass movement in India......The movement of Sri Chaitanya helped also very largely to emancipate the so-called lower classes or castes of Bengali Hindus from the many social evils under which they had been living in the old Brahmanical society......All these had a tremendous influence in working the uplift of the Bengali masses."৭

এই যে প্রচণ্ড গণ-আন্দোলনের অনুমান করা হইতেছে তাহার নজীর কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিশেষ কিছু উল্লেখ নাই এবং বাংলার ইতিহাসও এ-বিষয়ে নীরব। চৈতন্যের সময়ে সনাতনী-প্রপীড়িত জাতি-সমূহের কি-অবস্থা ছিল এবং ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়া তাহাদের কি-উন্নতি হইল, এক কথায়, তাহাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি-অবনতির কোন সংবাদই বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাওয়া যায় না। কেবল মন্ত্র দিয়া পতিতকে উদ্ধার করার খবরই পাওয়া যায়! কিন্তু এস্থলে বিচার্য্য-বিষয়, পতিত কাহাকে বলে? কারণ জাতীয় প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা এবং মহাপণ্ডিত রামানন্দ রায়কে নীচ শূদ্র বলা হইয়াছে। আবার বাদশাহ-এর অমাত্য রূপ ও সনাতনকে পতিত বলা হইয়াছে। পুনঃ, সুবর্ণবণিকজাতীয় ধনী উদ্ধারণ দত্ত কি পতিত ছিলেন এবং "নবশাক" (নবশায়ক) জাতি-গুলি কি পতিত ছিল? ইতিহাসের কোন্ অর্থনীতিক, কারণবশতঃ এই বেশীর ভাগ হিন্দু ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিল এবং কোন্ কারণবশতঃ বেশীর ভাগ বাঙ্গালী, হয় মুসলমান—না হয় বৈষ্ণব হইল, এ সব প্রশ্নের কোন সমাজতাত্ত্বিক সংবাদ পাওয়া যায় না। যদি ধরা যায়, ভাবের প্রেরণা

(৭) B. C. Pal—Bengal Vaishnavism—pp. 119-120.

দ্বারা ইহা সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা হইলে ইহাও সত্য যে, ভাবের (idea) পশ্চাতে থাকে feeling এবং তাহার পশ্চাতে থাকে স্বার্থ (interest)। তাহা হইলে ইহা জানা একান্ত প্রয়োজন যে, সমাজ-বিপ্লব বা সংস্কার কোন্ feeling বা স্বার্থদ্বারা সংসাধিত হইয়াছিল?৮

বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচার আন্দোলন

আজকাল শুনা যায় যে, বৌদ্ধযুগই বাঙ্গালীর গৌরবের কাল। তখনকার বাঙ্গালীর কর্ম্মকুশলতা চারিদিকে বিস্তারিত হইয়াছিল। বাঙ্গালী-বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারকগণ (missionary) সে-সময়ে বাঙ্গলার কৃষ্টি বহন করিয়া দেশ-বিদেশে গমন করিয়াছেন। চৈতন্যের শিষ্যবর্গ এই প্রকারে বাঙ্গালীর কৃষ্টির প্রচার করিতে কম চেষ্টা করেন নাই! বোধ হয়, বৌদ্ধদের পরই বৈষ্ণবদের এই ধর্ম্মপ্রচার প্রচেষ্টা ও উদ্যম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। পরলোকগত শাস্ত্রী মহাশয় এক বক্তৃতায় খুব গর্ব্বের সহিত বলিয়াছিলেন যে, বাংলা হইতে বৌদ্ধ কৃষ্টিকে নিশ্চিহ্ন করিয়াছে দুই হাজার ব্রাহ্মণ-গোষ্ঠী!৯ কিন্তু এই সনাতনী-প্রপীড়িত সমাজ যখন স্রোতের ন্যায় বিদেশীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছিল, সেই স্রোতের বিপক্ষে বাঁধ বাঁধিয়া দিয়া নিজেদের উদারমতের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া বেশীর ভাগ হিন্দুদের টানিয়া আনিয়াছেন এই বৈষ্ণবেরা; এইযুগে বাংলার বাহিরে বাঙ্গালীর ধর্ম্ম ও কৃষ্টি সংস্থাপিত করিয়াছেন চৈতন্যের শিষ্যবর্গ। চৈতন্যের শিষ্যগোষ্ঠী উড়িষ্যা, ত্রিপুরা, মণিপুর, কাছাড়, আসাম প্রভৃতি স্বাধীন

(৮) Lester Ward—Applied Sociology দ্রষ্টব্য।

(৯) ৺শাস্ত্রী—সাহিত্য পরিষদের বাৎসরিক অধিবেশনের বক্তৃতা দ্রষ্টব্য (সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা ৩৬ ভাগ, ৩য় সংখ্যা)।

রাষ্ট্রসমূহকে নিজেদের সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া নিয়াছেন, এবং ইহার বাহিরে ব্রহ্মেও তাঁহারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ব্রহ্মের বৌদ্ধদের পৌরোহিত্য করেন "পোনাবালিয়া" ব্রাহ্মণেরা। ইঁহারা মণিপুরী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ। বাঙ্গালী বৈষ্ণবেরা মণিপুরীদের স্বধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছেন। এই মণিপুরীরাই আবার ব্রহ্মের সীমার বাহিরেও যজমানী করিতে যান। নবদ্বীপের মণিপুরীদের মন্দিরের এক বাবাজীর নিকট হইতে লেখক শুনিয়াছেন যে, এই পোনাবালিয়ারা নবদ্বীপে তীর্থ করিতে আসেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মতে গুজরাটের বল্লভাচারী সম্প্রদায় তাঁহাদেরই একটি শাখা-মাত্র। তাঁহারা বলেন, বল্লভাচার্য্য পুরীতে চৈতন্যদেবের নিকট মন্ত্র গ্রহন করেন (কিন্তু এই সম্প্রদায় এখন আর একথা স্বীকার করেন না)। বৈষ্ণবেরা বৃন্দাবন আবিষ্কার করিয়া জঙ্গল পরিষ্কারপূর্ব্বক এই নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং রাজপুতানায়ও নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। নবদ্বীপবাসী নিত্যানন্দের বংশের লেখকের কোন এক বন্ধু, প্রয়োজনবশতঃ কোন স্থান হইতে কত সংখ্যার যাত্রী নবদ্বীপে প্রতি বৎসর আসে একবার তাহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে তিনি মণিপুর সেবাসমিতির সেক্রেটারীর নিকট হইতে এই তথ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, প্রতি বৎসর ৮৪,০০০ হইতে ৯৫,০০০ হাজার মণিপুরী যাত্রী নবদ্বীপে তীর্থ করিতে আগমন করেন এবং উড়িষ্যা হইতেও প্রতি বৎসর নবদ্বীপে ২০,০০০ হইতে ২৫,০০০ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়।১০ উক্ত ঘটনা হইতে বৈষ্ণবদের এক সময়কার missionary কার্য্যতৎপরতারই পরিচয় পাওয়া যায়। আজকাল সাঁওতালদের মধ্যে মাথায় টিকি ও গলায় মালা দেখা যাইতেছে। এই missionary আন্দোলনের জোর এখনও প্রতিহত হয় নাই।)

(১০) বোধ হয়, এই সংখ্যার যাত্রীর সমাগম বিশিষ্ট যোগ পউলক্ষেই হইয়া থাকে।

ধর্ম্মপ্রচারে সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব

এক্ষণে কথা উঠে, এই বিপুল প্রচার-প্রচেষ্টা কি কোন একটি উৎস হইতে বিনির্গত হইত, না ব্যক্তিগত খামখেয়ালির বশবর্ত্তী হইয়া চারিদিকে ধাবমান হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের প্রথম যুগে দেখা যায়, চৈতন্যদেবের আদেশানুযায়ী রূপ সনাতন প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারার্থ বৃন্দাবনে উপনিবেশ স্থাপন করিযাছেন,১১ তাঁহারই আদেশে নিত্যানন্দ বাঙ্গলায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন,১২ তাঁহারই আজ্ঞায় এই নূতন সম্প্রদায়কে পরিচালনার জন্য একটি "স্মৃতি-পুস্তক"ও রচিত হয়,১৩ এবং তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহারই আজ্ঞা সর্ব্ববিষয়ে বলবৎ হইত। বিশাল হিন্দুসমাজ হইতে যে পৃথক একটা সমাজ গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহার পরিচালনার ব্যবস্থাও প্রথমযুগের নেতারা করিয়াছিলেন। চৈতন্য, নিত্যানন্দ প্রভৃতির মৃত্যুর পর, নরোত্তম ঠাকুর, শ্যামানন্দ গোস্বামী এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য এই নূতন সম্প্রদায়ের পরিচালক হন। তাঁহাদের পর বীরচন্দ্র গোস্বামী নেতা হন। এই সময়ে এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় নেতাদের হুকুম মানিয়া চলিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, জয়গোপাল দাস নামে জনৈক কায়স্থকে প্রসাদ-লঙ্ঘন অপরাধে ত্যাগ করিতে বীরচন্দ্র শ্রীনিবাসকে হুকুম দেন, কেহ যেন ইহার সহিত কথা না বলে।১৪ চৈতন্যের জনপ্রিয়তা দেখিয়া তাঁহার জীবিতকালেই গুটিকতক false prophets (প্রতারক) খাড়া হন। একজনের নাম ছিল কবীন্দ্র; সে বলিত যে সে স্বয়ং রাম, উপস্থিত বৈকুণ্ঠধাম হইতে আগমন করিয়াছে। তাহাকে লোকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিত, "কপীন্দ্র"। ইহার পর মাধব নামে এক ব্রাহ্মণ

(১১) চৈ, চ, ম ২৫ পরিচ্ছেদ ও চৈ, চ, অ ৯।২৫৫-২৭২।

(১২) চৈ, চ, ম, ১৫ পরিচ্ছেদ।

(১৩) শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত—'শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য' পৃঃ ৪০৪।

(১৪) ভক্তিরত্নাকর—পৃঃ ১০৪৬।

চূড়াধড়া পরিয়া কৃষ্ণ সাজিয়া একদল স্ত্রী ও পুরুষ লইয়া বেড়াইত এবং নিজেকে গোপাল বলিয়া পরিচয় দিত। লোকে তাহাকে 'শিযাল' বলিত। এই লোকটি সদলে পুরীতে চৈতন্যের নিকট গিযা হাজির হয়। তিনি সংকীর্ত্তন হইতে এই দলটিকে বাহির করিযা দেন। পরে ইহাদের বিপক্ষে এই মর্ম্মে এক ফতোয়া জারী হয় যে, কোন বৈষ্ণব যেন ইহাদের গাত্রস্পর্শ না করে এবং ইহাদের সহিত আলাপ ও ভোজন না করে।১৫

এই সম্প্রদায়ের সাহিত্য পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের ন্যায় মণ্ডলী পরিচালনার ভার গুরু বা তৎস্থলাভিষিক্ত মোহন্তের উপর ন্যস্ত ছিল। সমাজ বা ধর্ম্মমণ্ডলীকে চালাইবার জন্য কোন একটি কেন্দ্রীভূত কার্য্যকরী সভা ছিল না। বৌদ্ধেরা যে সামান্য সঙ্ঘবদ্ধতা মণ্ডলীর মধ্যে আনয়ন করিয়াছিল তাহাও বৈষ্ণবদের মধ্যে উদ্ভূত হয় নাই। বৌদ্ধ সংঘারাম নিজের একটা নিয়মাধীনে থাকিত। কিন্তু সব সংঘগুলিকে একটা কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্বের অধীনে আনিবার কোন ব্যবস্থা বৌদ্ধ আন্দোলনে ছিল না, এবং কোন হিন্দু সম্প্রদায়েই তাহা উদ্ভূত হয় নাই।১৬ খৃষ্টীয়ধর্ম্ম যে প্রকারে রোমান সাম্রাজ্যের বুরোক্রেশীর অনুকরণে নিজের মণ্ডলী গঠনপূর্ব্বক কঠোরভাবে কেন্দ্রীভূত ও নিয়মাবদ্ধ হয় তদ্দ্বারা ইউরোপীয় জাতিদের সমাজ মধ্যে একত্ব ও বাধ্যতা (discipline) বিবর্ত্তিত হয়, কিন্তু ভারতীয় ধর্ম্মপন্থা সমূহ মধ্যে চিরকালই এইটির অভাব।

এই কেন্দ্রীভূত সঙ্ঘবদ্ধতার অভাবেই হিন্দু এত শতধাবিচ্ছিন্ন। হিন্দু সর্ব্ববিষয়েই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করে। সমষ্টিগতভাবে কর্ম্ম করিবার শিক্ষা তাহার হয না; সেইজন্যই হিন্দু এত

(১৫) বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী "গৌড়গণচন্দ্রিকা"; "ভক্তিরত্নাকর"।

(১৬) R. C. Mazumdar—Corporate Life in Ancient India.

ব্যক্তিত্ববাদী (individualistic)। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মেও সেই অনুষ্ঠান (phenomenon) দৃষ্ট হয়। যত দিন সমাজ ক্ষুদ্র ছিল, ততদিন এক নেতার বাক্য বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিপালিত হইত। কিন্তু পরে যখন প্রথম যুগের শিষ্যদের বংশধরেরা গুরুগিরি করিতে আরম্ভ করে, এবং তাহা চিরপ্রচলিত যজমানী ব্যবসায়ে পরিণত হইতে লাগিল, তখন পূর্ব্বের একতা আর রহিল না। প্রত্যেকেই নিজের গুরুর হুকুমাধীন হয়। এই গুরুরা আসিয়া সম্প্রদায়কে পুরাতন সনাতনী খাদে পরিচালিত করিতে লাগিল। ইহার ফলে, সনাতন সমাজ হইতে ইহার পার্থক্য কমিয়া যাইতে লাগিল।

অন্যান্য সম্প্রদায় হইতে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি পৃথক ও স্বাধীন সম্প্রদায় গঠন করিবার প্রচেষ্টা প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের নেতাদের মধ্যে হইয়াছিল। এইজন্যই বলা হইত "না করিবে অন্য দেবের নিন্দন বন্দন। না করিবে অন্য দেবের প্রসাদ ভক্ষণ।" কিন্তু পরবর্ত্তিকালের নেতারা এবং শিষ্যেরা সনাতনপন্থীয় অনেক ব্যবস্থা এই নূতন সম্প্রদায়ে প্রবেশ করাইয়া ইহার আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দেয়।১৭ তত্রাচ সনাতনপন্থীয় প্রথা হইতে এই সম্প্রদায়ের কিঞ্চিৎ সঙ্ঘবদ্ধতা আছে; যথা, "ছড়িদার প্রথা"। প্রত্যেক গোস্বামী গুরুর অধীনে ছড়িদার থাকে। তাহারা গুরুর হুকুমে শিষ্যদের ডাকিয়া আনে। এতদ্দ্বারা প্রত্যেক গুরু নিজের Diocese-এ (শিষ্যমণ্ডলী মধ্যে) একটা Organisation করিয়া রাখে। অবশ্য ইহা exploitation-এর উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়। তত্রাচ এই প্রকারে নিজের শিষ্যদের প্রয়োজনানুসারে rally করান (ডাকা) অনুষ্ঠানটি সনাতনী গুরুদের ব্যবস্থা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ সঙ্ঘবদ্ধতা বা একত্রীকরণের পরিচয় প্রদান করে। কিন্তু শুনা যাইতেছে যে, ইহাও অনেক যায়গায় উঠিয়া যাইতেছে।

(১৭) B. C. Pal—"Bengal Vaishnavism", p. 122.

১১

বৈষ্ণব সাহিত্যে বাঙ্গালী 'Chauvinism'

বৈষ্ণবসাহিত্যে একটি অনুষ্ঠান প্রণিধানযোগ্য ; ইহা হইতেছে বৈষ্ণবদের স্বদেশ সম্পর্কে chauvinism, অর্থাৎ নিজের দেশকে বড় করিয়া দেখা। সুদূর অতীতে বেদের ব্রাহ্মণেরা "বঙ্গ, বগধ, চের" জনপদের লোক কাকসদৃশ বলিয়া ঘৃণা করিয়া গিয়াছেন।১ তদনন্তর, বৌধায়ণ প্রভৃতি স্মৃতিতে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে গমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিবার কথা উক্ত আছে। ইহারও পর মনু বলেন, যেখানে কৃষ্ণসার মৃগ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে না, তথায় ব্রাহ্মণেরা বাস করিবেন না! অবশ্য, বঙ্গপ্রদেশে এই মৃগ পাওয়া যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্যজনক ঘটনা এই যে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে দেখা যায় যে বাঙ্গলার হিন্দু, অর্থাৎ সনাতনপন্থীয় ব্রাহ্মণ লেখকেরাই বাঙ্গলাকে বড় করিয়া দেখিয়াছেন। খৃঃ ১০ম শতাব্দীতে ভবদেব ভট্ট বলিতেছেন, জগতে একমাত্র বিখ্যাত এবং আর্য্যাবর্ত্তদেশের অলঙ্কারস্বরূপ হইতেছে সিদ্ধল গ্রাম ২ যাহা সকলের অগ্রবর্ত্তী এবং রাঢ়ের ভাগ্যলক্ষ্মীর অলঙ্কার"।৩ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র বিরচিত "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটকে বলা হইতেছে,—

"অত্যুত্তম রাজ্য এক গৌড় তার নাম
তাহারি গো রাঢ়দেশে ভুরিশ্রেষ্ঠ গ্রাম।"

এতদ্দ্বারা এই অনুষ্ঠানটী প্রত্যক্ষ করা যায় যে, উত্তরাপথের ব্রাহ্মণদের বংশধরেরা বঙ্গপ্রদেশে বাস করিয়া এ-দেশের স্বদেশপ্রেমিকতার উদ্ভব

(১) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ।

(২) ৺শাস্ত্রীর মতে সিদ্ধল গ্রাম বর্ত্তমানের বীরভূম জেলার অন্তর্গত সিধলা গ্রাম।

(৩) Inscriptions of Bengal—Vol.III by N. G. Mazumder.

করেন। তখন তাঁহারা এই দেশকেই বড় করিয়া দেখিতে থাকেন। বৈষ্ণব-সাহিত্য বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের স্বদেশের প্রতি এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষভাবে নজীর প্রদান করে। নিত্যানন্দ যখন চৈতন্যের আদেশে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, তখন নরহরি বলিতেছেন,—

"উৎকল হইতে গৌড়দেশে প্রবেশিয়া। গৌড়দেশ প্রশংসয়ে প্রেমে মত্ত হৈয়া। গৌড়ভূমি যেছে তাহা না হয় বর্ণন। বহু পুণ্য তীর্থের যে মস্তক ভূষণ। ......তীর্থময় গৌড় পৃথ্বী মহিমা কে জানে"(৪)। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে উক্ত হইয়াছে—'গৌড়-ক্ষৌণী জয়তি কতমা পুণ্য তীর্থাবতংস-প্রায়া যাসো বর্ত্তি নগরীং শ্রীনবদ্বীপনাম্নীং।" (২য় অঙ্ক ১৪ শ্লোক)।

এই উভয় স্থানেই গৌড়কে তীর্থময় স্থান বলা হইয়াছে। চৈতন্য ভাগবতে উল্লিখিত আছে, "রাঢ় দেশ ভূমি যত দেখিতে সুন্দর" (অ, ১।৫৯)।

ভক্তিরত্নাকরে বর্ণিত আছে, চৈতন্যের তিরোভাবের পর যখন শ্রীনিবাস, নরোত্তম প্রভৃতি বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নবদ্বীপ দেখিতে গেলেন তখন গৌরাঙ্গের পুরাতন ভৃত্য ঈশান তাঁহাদের নবদ্বীপ প্রদর্শন করান এবং ঈশান বৈদিক ও পৌরাণিক দেবদেবী, অবতার, ঋষি প্রভৃতিদের নবদ্বীপে আনাইয়া তাঁহাদের ঘাড় নীচু করাইয়াছেন। দুই একটি দৃষ্টান্তে ইহার রস প্রতীত হইবে।

"ঈশান ঠাকুর শ্রীনিবাস প্রতি কয়......নবদ্বীপে পার্ব্বতী আসিয়া এই স্থানে আরাধয়ে শ্রীগৌরসুন্দর ভগবানে (পৃঃ ৭২১)।" আবার, "প্রভু অদর্শনেতে ব্যাকুল ঋষিগণ... গঙ্গাতীরে কুমারহট্টের সন্নিধানে। দেখিয়া অপূর্ব্ব স্থান রহে সেইখানে।" (পৃ৭২৭) পুনঃ, "এই মাউগাছি গ্রাম লোকেতে প্রচার.. পালিতে পিতার সত্য কৌশল্যাতনয়...... আইছেন এথা যেছে উপমা বিদিতে।" (পৃঃ ৭৪২।৭৪৩)। আবার, "নারায়ণে নারদ দর্শন এথা কেল। এই হেতু নারায়ণ পীঠ নাম হৈল" (পৃঃ ৭৪৯)। পুনরায়, "একচক্রা হইতে পাণ্ডব পঞ্চ ভাই। নবদ্বীপে আসি উত্তরিলা এই ঠাঁই" (পৃঃ ৭৫৩)। আবার, "এ

(৪) 'ভক্তি-রত্নাকর'—পৃঃ ৫৯৭

ভারইডেঙ্গা দেশ অপূর্ব্ব বসতি। পূর্ব্বে ভারদ্বাজ টীলা নাম ব্যক্ত যৈছে।...ভরদ্বাজ মুনি সমুদ্রাদ তীর্থ হৈতে। আইলে চক্রদহ গঙ্গা সমীপেতে। এবে চক্দহে লোক চাকদা কহয়" (পৃঃ ৭৫৬-৭৫৭)। ইত্যাদি।

এই প্রকারে চৈতন্যসম্প্রদায়ের বাঙ্গালীরা নিজেদের দেশ বড় করিয়া দেখিয়া 'বাঙ্গালীয়ানা' ভারতের চারিদিকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এক্ষণে কথা এই যে, এবম্প্রকারের স্বদেশ-প্রেমের আধিক্য কি প্রকারে কান্যকুব্জ ও অন্যান্য স্থান হইতে আগত লোকদের বংশধরদের মধ্যে উদ্ভূত হইল? সমাজতত্ত্ববিদেরা বলেন, কৌমাবস্থায় (tribal stage) বাসভূমির প্রতি প্রেমের উদয় হয় না, তখন কৌমগত প্রেমের উদ্ভবই হয়। কিন্তু যখন একটা লোকসমষ্টি একটা নির্দ্দিষ্ট জনপদে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকে, তখন সেই জমির সহিত সনাক্ত (identified) হইয়া তাহার নামে নিজে পরিচিত হয়। তখন আর কৌমগত সভ্যতা থাকে না; তখন লোকে নিজের বাসভূমির নামেই পরিচিত হইতে গর্ব্ব অনুভব করে। ডুরখাইম (Durkheim) এবং তাঁহার দলের সমাজতত্ত্ববিদেরা বলেন, টটেমগত (totemic) সংঘবদ্ধতার পরিবর্ত্তে যখন সামাজিক সংঘবদ্ধতার উদয় হয় তখন গোষ্ঠীগত অস্তিত্বের বদলে জনপদগত সমষ্টি (territorial communes) বিবর্ত্তিত হয়। তখন গোষ্ঠীর উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য ভুলিয়া সকলে এক বাসভূমির লোক, এই ধারণারই উদ্ভব হয়। গোষ্ঠীগত অবস্থার (clan phase) পরই বাসগত প্রদেশ (territorial districts, marches, communes) উদ্ভব হইতে দেখা যায়।৫

এই কথা ভারতেও প্রযুজ্য। এই মহাদেশে কৌমের নামে পরিচিত হইবার বিবর্ত্তনের পরবর্ত্তী স্তর হইতেছে একটা জনপদে স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়া উহার নামে পরিচিত হওয়া। বৈদিক বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, আঙ্গি-

(৫) Durkheim—'La division du travail social' 2nd edition, 1902; Moret & Davy—"From tribe to Empire" pp. 55-55.

রসাদি কুলের পরিবর্ত্তে এখন ব্রাহ্মণদের মধ্যে কনোজিয়া, সরযুপারী, মালবীয়া, দেশস্থ, কানাড়া, বারেন্দ্র, রাঢ়ী প্রভৃতি নামে পরিচিত ব্রাহ্মণশ্রেণী উদ্ভূত হইয়াছে। ভারতে যে-স্থলে যে-সব লোকসমষ্টি কৌমাবস্থার অতীত হইয়া একটা জনপদের সহিত সনাক্ত হইয়াছে, তথায়ই দ্বিতীয় স্তরের সামাজিক বিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়।

বাঙ্গলায় এই কৌমাবস্থা বোধ হয় সুদূর অতীতেই অতিবাহিত হইয়াছে। এই প্রদেশে সেনরাজাদের সময় হইতে যখন সমাজের সংবাদ-প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন দেখা যায় যে জাতিসমূহ একটা নির্দ্দিষ্ট জনপদের সহিত সনাক্ত হইয়াছে, যথা, রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বঙ্গজ ইত্যাদি। বাঙ্গলার লোক কৌমাবস্থার সঙ্ঘবদ্ধতা হইতে সুদূর অতীতকালেই উত্তীর্ণ হইয়া জনপদগত সঙ্ঘবদ্ধতার স্তরে প্রবেশ করিয়াছে। যেমন, রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ, দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ; রাঢ়ী সুবর্ণ-বণিক, রাঢ়ী (শ্রীখণ্ড) বৈদ্য; বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র কায়স্থ, বারেন্দ্র তেলী, বারেন্দ্র বৈদ্য, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র কুম্ভকার ইত্যাদি। সভ্যতার এই বিবর্ত্তনের ফলেই অতীতে বোধ হয় বাঙ্গলা মগধ হইতে পৃথক্ হইয়া নিজের ব্যক্তিত্ব, অর্থাৎ "বাঙ্গালীয়ানা" বিবর্ত্তিত করিয়াছে। তজ্জন্য বাঙ্গলার "প্রকৃতিপুঞ্জ" গোপাল নামে 'দাসজীবিন' জাতীয় একজন সামন্তকে রাজপদে নির্ব্বাচন করিয়া বাঙ্গালী একজাতীয়তা (nationality) বিবর্ত্তিত করে। অতীতের এই বিবর্ত্তনকে লেখক বাঙ্গলার **First Social Integration,** অর্থাৎ বাঙ্গলার সমাজের প্রথম সমীকরণ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এই সমীকরণের পর, ভারতের চারিদিক্ হইতে বিভিন্নজাতীয় লোক এই প্রদেশে আসিয়া যে বসবাস করিয়াছেন, ইতিপূর্ব্বে সে বিষয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় বৈষ্ণবসাহিত্য হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তৎপরে, বর্ত্তমান হিন্দু-বাঙ্গালী সমাজের বিবর্ত্তন হয়। ইহার মধ্যে কর্ণাটি, কনোজিয়া, উড়িয়া, দাক্ষিণাত্য, পাশ্চাত্য প্রভৃতি দ্রবীভূত হইয়া হালের হিন্দু-বাঙ্গালী

অভিব্যক্ত হইয়াছে। এই সঙ্ঘবদ্ধতাকে লেখক **Second Social Integration,** অর্থাৎ দ্বিতীয় সামাজিক সমীকরণ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এই দ্বিতীয় সমীকরণের ফলেই বাঙ্গালী chauvinism সাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাঙ্গলা আর ঘৃণ্য ও ব্রাহ্মণ-বর্জ্জিত দেশ নয়, গৌড় এক "অত্যুত্তম রাজ্য"! এই দ্বিতীয় সমীকরণের অন্তর্গত লোকেরা কুল অপেক্ষা দেশকে বড় করিয়া দেখিয়াছেন এবং নিজেদের স্বষ্ট সংস্কৃতির জন্য গৌরবান্বিত! এই মনোভাব কেবল বৈষ্ণবসাহিত্যেই গণ্ডীভূত নয়, অন্য ধর্ম্মের সাহিত্যপাঠেও ইহার সন্ধান পাওয়া যাইবে। "শিবায়ন" গ্রন্থে দেখা যায় যে, শিব বাঙ্গলায় চাষের কার্য্য করিতেছেন। জনশ্রুতি বলে যে, কৃত্তিবাস রামায়ণের মহারাবণের পূজিত ও আরাধিত কালী হনুমান বর্দ্ধমান জেলার যোগাদ্যা গ্রামে রাখিয়া গিয়াছেন ইত্যাদি! সে যাহা হউক, বাঙ্গলার হিন্দু আত্মস্থ হইয়া নিজেকে যখন বাঙ্গালী-হিন্দু বলিয়া বিকশিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তখন এই স্বদেশ-প্রেমিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমিকতার পূর্ব্বাভাস বৈষ্ণব-সাহিত্যেও প্রাপ্ত হওয়া যায়

বৈষ্ণবধর্ম্ম ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে বৈষ্ণবসাহিত্য একেবারে নীরব। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা কতকগুলি স্বাধীন ও অর্দ্ধ-স্বাধীন রাজা ও তৎসঙ্গে শাসকশ্রেণীর লোকদের স্বীয় সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়াছিল। কিন্তু সেইসব রাজ্যপরিচালনা সম্বন্ধে নূতন কোন রাজনীতিক আদর্শ উদ্ভব করিবার নিদর্শন এই সাহিত্যে পাওয়া যায় না। তৎপরে বাঙ্গলার হিন্দুর পরাধীনতার প্রতিকারকল্পে কোন প্রচেষ্টার কথাও এই সাহিত্যে পাওয়া

যায় না। বোধ হয় এই প্রকার অবস্থায় প্যালেষ্টাইনে যিশুখৃষ্টোক্ত "Render unto Caesar what is Caesar's, unto God what is God's", নীতিই বাংলায় অনুসৃত হইয়াছিল।

এই যুগে উত্তর-ভারতে যতগুলি ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকের দল সমুদ্ভূত হইয়াছিল, সেইগুলির মধ্যে নানক কর্ত্তৃক স্থাপিত 'শিখ' ও 'সৎনামী' এবং আসামের 'মায়ামারা' সম্প্রদায় ৬ ব্যতীত কোন দলই রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরাও তদ্রূপ। ইহারা সনাতনী পৌরোহিত্যবাদের প্রকোপ কমান এবং তাহা দ্বারা উৎপীড়িতদের কষ্ট লাঘব করিবার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবসাহিত্যে রাজনীতিক প্রতিক্রিয়া

স্বতঃই এখানে একটা প্রশ্ন উঠে, তুর্কী—মুসলমান দ্বারা উত্তর-ভারত বিজয়ের পর চারিদিক হইতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক গীতিকাব্যের উদয় হয় কেন? পশ্চিম-ভারতে রাজপুত রাষ্ট্রগুলির অবসানের পরই চারণ-গাথাগুলি রচিত হওয়া বন্ধ হইয়া যায়; তৎপরিবর্ত্তে ব্রজ-ভাষায় কৃষ্ণপ্রেম সম্বন্ধীয় কাব্যসমূহ রচিত হইতে থাকে। রামকুমার বর্ম্মাজি বলেন, "পরাধীনতার যুগে হিন্দু আর কি করিবে, ধর্ম্মের ভিতরেই সান্ত্বনা পাওয়ার চেষ্টা করিতে লাগিল!"৭ কিন্তু এই উত্তরই পর্য্যাপ্ত নহে। কারণ, এখানে ইহাও জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায়, এই ধর্ম্ম-সাহিত্য মধ্যে এত বিচ্ছেদ ও ক্রন্দনের রোল কেন শুনা যায়? উপনিষৎ, পুরাণ, বৌদ্ধ এবং জৈন-সাহিত্যেও ধর্ম্মের কথা আছে। কিন্তু এ-সকলের মধ্যে কেন নায়কের বিচ্ছেদে নায়িকা 'যোগিনীপারা' হইয়া কাঁদিয়া আকুল হয় নাই? কেন

(৬) N. N. Basu—"History of Kumarup" Vol. III.

(৭) "হিন্দী সাহিত্য কা আলোচনাত্মক ইতিহাস।"

বৈষ্ণবসাহিত্যে এত বিচ্ছেদের হা-হুতাশ শুনা যায়, কেন রাজনীতি-বিরহিত হায়-হায় রবের ধ্বনি শুনা যায়? আবার জয়দেবের কাব্যেই বা কেন এই ক্রন্দনের ধ্বনি নাই এবং তাহার শ্রীমতীই বা কেন 'যোগিনীপারা' নন্? ইহার উত্তর এই যে, তৎকালীন পারিপার্শ্বিক রাজনীতিক অবস্থা বৈষ্ণব-সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। হিন্দু স্বাধীনতা হারাইয়া এবং জীবনের সবদিকেই নির্ম্মমভাবে পিষ্ট হইয়া হা-হুতাশের মধ্যেই জীবনযাপন করিতেছিল। কাজেই সেই ক্রন্দনের ধ্বনি এবং পরাধীনতাজনিত পরাভব-মনোবৃত্তির (defeatist mentality) উদয় হয়। তাহারই প্রতিধ্বনি বৈষ্ণবসাহিত্যে পাওয়া যায়। তৎকালীন রাজনীতিক অবস্থাজনিত মনস্তত্ত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় চণ্ডীদাসে। জয়দেব যখন দশ অবতার স্তোত্রে বলিলেন, "ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্", তখন চণ্ডীদাস দশ অবতার বিষয়ে বলিতেছেন—"পুনঃ তা ত্যজিয়া কল্কি অবতার ধরেন মরতি কায়া"। এস্থলে জয়দেবের ন্যায় সে গর্জ্জন নাই। ইহারই কারণ কি? বহু শতাব্দী পর কবি হেমচন্দ্র ইহার জবাব দিয়াছেন, "ভয়ে ভয়ে লিখি, কি লিখিব আর, না হলে শুনাতাম এ বীণার ঝঙ্কার"। জয়দেবের পর বৈষ্ণব কবিরা শ্রীমতীকে গেরুয়া-বসনা সাজাইয়াছেন এবং মাথুরের বিচ্ছেদে কাঁদিয়া ভাসাইয়াছেন। ইহার কারণ জানিতে হইলে জিজ্ঞাসুদের "নূতন মনস্তত্ত্ব," যাহাকে চলিত কথায় 'Freudian Psychology' বলা হয়, তাহার আশ্রয় লইতে হইবে। এই তত্ত্বানুসারে মনের ইচ্ছাসমূহ (urges) অবদমিত (repressed) হইয়া মনে ঘনীভূত (sublimated) হইয়া অজানিত মন-এর (subconscious mind) পর্দ্দার অন্তরালে আবদ্ধ থাকে। সেইটাই ঘটনাচক্রে বিভিন্ন আকারে জাগিয়া উঠিয়া পরিস্ফুট হয়। বৈষ্ণবসাহিত্যে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ নাকি এই সাহিত্যকে উপরোক্ত প্রকারের repression এর ফলস্বরূপ বলিয়াছেন। সেইজন্যই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর (Astronomical

bodies) গতিকে প্রথমে রাসলীলা বলিয়া রূপকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। তৎপরে ইহার আধ্যাত্মিক রসব্যাখ্যা শেষে কদর্য্য আদিরসে পরিণত হইয়াছে।৮ এই প্রকারেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে শেষ পর্য্যন্ত অনেক erotic and suggestive পদাবলী রচিত হইয়াছে ; ৯ এবং ভক্তেরা তাহা ভক্তিসহকারে পাঠ করিয়া থাকেন। অন্যপক্ষে, "নূতন মনস্তত্ত্বই" বলিবে যে, রাজনীতিক repression-এর ফলে মনের ইচ্ছাসমূহ (urges) রূপান্তরিত হইয়া এই বিচ্ছেদ ও ক্রন্দনের রোলরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন, "শূন্য পুরাণে রমাই পণ্ডিত তুর্কীর আগমনে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছে। তাহার পর যুগে যুগে বাংলা ভাষায় যত বই লেখা হইয়াছে, সে সকলই পরাধীনতার বৃশ্চিক-দংশন জ্বালা অপসারিত করিবার প্রলেপ উদ্ভাবন চেষ্টায় লিখিত হইয়াছিল"।১০ ৺দীনেশবাবু বলিয়াছেন,—

"বৈষ্ণবের মাথুরগান একদিকে নিমাই সন্ন্যাসের দ্বারা কারুণ্যে ভরপুর হইয়াছে, অপর-দিকে তৎকালীন ইতিহাস সেই বিয়োগান্ত দৃশ্যের উপাদান যোগাইয়াছে।......কত বিয়োগান্ত নাটকের সার নিংড়াইয়া যে 'মাথুরগান' রচিত হইয়াছিল, তাহা বলিবার নয়... বাঙ্গালীর রণক্ষেত্র ও কামকুঞ্জ একই যুগে একই বিয়োগান্ত দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল। এই জন্য বঙ্গসাহিত্যময় সর্ব্বত্র একই সুরের সাড়া পাই।" (১১)

এই উক্তি অতিশয় সত্য। বৈষ্ণবসাহিত্যে রাজনীতিক পরিবেদনার স্মৃতি বিচ্ছেদ ও ক্রন্দনে পরিণত হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদের বিরহিণী শ্রীমতীও সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছেন। চণ্ডীদাসের কাব্যকে একদিকে যেমন রাধার বিরহের ক্রন্দনধ্বনি বলা যায়, তদ্রূপ ইহাকে একজন স্বদেশ-প্রেমিকের হতাশতার বিলাপের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। তুলনা

(৮) "শ্রীনারদপঞ্চরাত্রং"—শ্রীরামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের দ্বারা অনুবাদিত।

(৯) জগবন্ধু ভদ্র "গৌরপদতরঙ্গিণী" দ্রষ্টব্য।

(১০) ভূমিকা—"বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী"—বসুমতী সংস্করণ।

(১১) "বৃহৎ বঙ্গ"—দ্বিতীয় খণ্ড—পৃঃ ৯৯৭-৯৯৯।

করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে, চণ্ডীদাস ও জ্ঞানদাসের যোগিনী শ্রীমতী, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠের' "অন্ধকারসমাচ্ছন্না কালী হৃতসর্ব্বস্বা-নগ্নিকা, মা যা হয়েছেন," কেবল নূতন যুগে নূতন রূপক প্রদত্ত হইয়াছে মাত্র।

অন্যত্রও এই প্রকারের রাজনীতিক পরিস্থিতিতে এবম্প্রকারের সাহিত্যের উদ্ভব হইযাছে। উত্তর-ভারতে ১৯ শত শতাব্দীর মুসলমান লিখিত উর্দ্দু-সাহিত্যেও সেই হা-হুতাশের রব পাওযা যায়। কথিত আছে, সুফীমতবাদ পারস্য দেশেই প্রথম উদ্ভূত হইযাছিল। কারণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন পারসিক জাতি আরবদের দ্বারা পরাজিত ও বিপর্য্যস্ত হইবার পর ধর্ম্মের "অতীন্দ্রিয়বাদে" (mysticism) আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহার কিয়ৎকাল পরেই মোঙ্গল আক্রমণের ভীষণ বন্যা আসিয়া মুসলমান জগৎ ছারখার করিযা দেয। পারস্যের এই সুফীমতবাদের উদ্ভব বিষয়ে Arnold বলিতেছেন,

"Let us turn to the East, where the Golden Age of Persian mysticism had already begun. It followed an epoch of indescribale carnage and devastation during which the Mongol barbarians swept across Persia. leaving only terror, misery and chaos behind them. In nation as an individual, intense and prolonged suffering needs an anodyne. No wonder that Persia too exhausted to help herself, turned for comfort to those who offered an ideal represent ation of things .....the mystic vision of everlasting peace and joy to be attained by the pure in heart, who contemplate within themselves the spiritual world that alone is real and enduring." (১২)

অতএব ইহা সুস্পষ্টরূপেই বোধগম্য হয় যে, পরাধীনতার ফলে হা-হুতাশের রোল বিরহ ও ক্রন্দনে পরিণত হইয়াছে।

(১২) T. W. Arnold, "Preaching of Islam" p. 228.

১২

পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থা

এক্ষণে এই নূতন আন্দোলনের সময়ে পারিপার্শ্বিক সমাজের অবস্থা দেখিতে হইবে। এই অবস্থা বুঝিবার জন্য বাংলা সাহিত্যে প্রচুর মাল-মশলা আছে। উহার মধ্য হইতে এখানে কয়েকটি মূলসূত্রের সন্ধান করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে।

জাতিতত্ত্ববিদেরা পৃথিবীর আদিম-জাতিসমূহের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আদিম অবস্থায় অবস্থিত জাতিসমূহ গাছ-পাথর, নদী পূজা (Totemism) করিবার পূর্ব্বে জন্তুপূজা (Animal-ism) করিয়াছে। এই ধর্ম্মবিশ্বাসের আগেরও একটা অবস্থা ছিল, যখন অন্য কিছু পূজা করিত (pre-animalism)১। এই প্রকারের ধর্ম্মবিশ্বাসগুলিকে এক্ষণে জাতিতত্ত্ববিদেরা "কৌমগত ধর্ম্ম" (Tribal religion) বলিয়া আখ্যাত করিতেছেন। ভারতবর্ষে এই 'কৌমগত বিশ্বাস' উচ্চতর ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্য হইতে আজও অন্তর্হিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম এবং তৎপরে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম উক্ত বিশ্বাসকে কুক্ষিগত করিয়াছে এবং "লৌকিক ধর্ম্ম" নামে ইহার নামকরণ করিয়াছে। এমন কি, ইসলামও ভারতীয় সাধারণ মুসলমানের মন হইতে এই বিশ্বাসকে সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত করিতে পারে নাই।

মধ্যযুগীয় বাংলায় এই প্রকারের সাধারণের লৌকিক ধর্ম্মের সহিত অভিজাতবর্গের শিব ও শক্তি পূজার সংঘর্ষ হয়। 'বিষহরি' পূজার সহিত শিবপূজার দ্বন্দ্ব সাহিত্যে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবসাহিত্যে এই সংবাদ পাওয়া

(১) Max Schmidt : Ethnology

যায় যে, লোকে 'বিষহরি', 'শীতলা', বাসুলি' প্রভৃতির পূজা করিয়া স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করে, অথচ কৃষ্ণ বা বিষ্ণুভক্তের দৈন্য ঘুচে না।২

বৈষ্ণবযুগের পূর্ব্বেও সমসাময়িক সাহিত্যে এই তথ্য পাওয়া যায় যে, অভিজাতশ্রেণী বিশেষভাবে শক্তির উপাসনা করিত। মুসলমান আক্রমণের পর হইতে চণ্ডী বা শক্তিপূজার আধিক্য দেখা যায়। এ-দেশের একদল পণ্ডিতের মত এই যে, 'মার্কণ্ডেয় পুরাণের' একাংশ 'চণ্ডী' বা 'দেবী-মাহাত্ম্য' নামে বাংলায় এই সময়ে প্রচলিত হইল। সুরথ রাজাকে 'কোলাবিধ্বংসী' লোকেরা তাঁহার রাজধানী নষ্ট করিয়া তাড়াইয়া দেয়, আর সেই রাজা শক্তির উপাসনা করিয়া তাঁহার নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। এই পূজা করিয়া সে হৃতরাজ্য ফিরিয়া পায় এবং ষড়ৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়। ইহাই হইতেছে 'দেবী মাহাত্ম্যের' সার কথা! বাঙ্গলার অভিজাতবর্গ হৃতসর্ব্বস্ব; সেইজন্য 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতার' আবাহন করিতে লাগিল। এই প্রকারের ব্যাখ্যাকারীগণের মত এই যে, বাঙ্গলায় ক্ষাত্রশক্তি অর্জ্জন নিমিত্ত, ও নিপীড়নের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য শক্তিপূজা এত জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।৩ এই স্তোত্রে যে-ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, যজুর্ব্বেদের 'শতরুদ্রীয়' স্তোত্রেও সেই ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা অনুমিত হয় যে, বৈদিকযুগে যখন ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে শ্রেণী-সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া অত্যাচার করিতেছিল, তখন ক্ষত্রিয়, ব্রাত্য ও তস্করের ভয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বত্র বিরাজমান রুদ্রের আহ্বান করেন।৪

(২) চৈ. ভা. অা ১২ ১৮৩ ১৮৮।

(৩) কবিকঙ্কণ চণ্ডী—বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

চণ্ডী মঙ্গলবোধিনী—৺চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত—পৃঃ ৯২৯ ৯৩০ এবং ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচনা দ্রষ্টব্য।

(৪) ওয়েবার বলেন, বৌদ্ধদের মতে তাহাদের বিপক্ষতাচরণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণেরা এই স্তোত্র রচনা করিয়া বেদে জুড়িয়া দেয়।

যাহাই হউক, 'দেবী-মাহাত্ম্যের' "কোলা-বিধ্বংসিনস্তদা'৫ শব্দ লইয়া নানা অর্থ রচিত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা উপরোক্ত মনোভাব স্পষ্ট হইয়াছে। কোন কোন টীকাকার ইহার অর্থ করিয়াছেন 'যবন', আবার কেহ বলেন, 'শূকর ধ্বংসকারী'; কেহ বলেন, 'কোল'জাতি, কেহ বলেন 'ক্ষত্রিয়'। কিন্তু কোন ব্যাখ্যাতেই 'মুসলমান' অর্থ প্রতিপাদিত হয় না; কেননা, মুসলমানেরা শূকর বিধ্বংসী নন। তত্রাচ ইহা সত্য যে, চৈতন্য-যুগের পূর্ব্বে তথাকথিত ভদ্রসমাজে শক্তিপূজার বিশেষ প্রচলন হইয়াছিল।

'আকবর-নামা' অনুসারে এই যুগের ভূস্বামীরা ছিলেন কায়স্থ। ৺শাস্ত্রী বলেন, কায়স্থেরা দেশের সমস্ত জমি দখল করিয়াছিল; তাহাদের অনুমতি ব্যতীত কেহ এক টুকরা জমি হস্তান্তর করিতে পারিত না।৬ ৺নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন, কানুনগোগিরি করিয়া আসমুদ্রহিমাচল সমুদয় জমি কায়স্থেরা হস্তগত করিয়াছিল৭ এবং তাহারা গৌড়ের সিংহাসনও অধিকার করিয়াছিল। অন্যদিকে ইতিহাসে ইহাও পাওয়া যায় যে, গৌড়ের সুলতানদের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ জমিদার বাঙ্গলায় ছিল। এই সময়ে কেন্দ্রীভূত হিন্দু রাজশক্তির অভাবে সমাজ পরিচালনা কার্য্য ব্রাহ্মণদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। কিন্তু এই কর্ম্মের জন্য যে-শক্তির প্রয়োজন, তাহা জনকতক পুরোহিত বা শাস্ত্রচর্চ্চাকারী পাইবে কোথা হইতে? কাজেই বুঝিতে হইবে যে, হিন্দু রাজশক্তির অভাবে স্থানীয় সামন্ত রাজা বা জমিদার পুরোহিতদের অনুশাসন সমাজে চালাইতেন। সেই জমিদারবর্গ হয় ব্রাহ্মণ, না হয় কায়স্থ অথবা অন্যজাতীয় লোক। ৺দুর্গাচন্দ্র সান্যাল বলিয়াছেন, "বাঙ্গলাদেশে ক্ষত্রিয় না থাকায় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থেরাই সমস্ত জমিদার ছিল। কোন নিকৃষ্টজাতীয় লোক

(৫) পাঠান্তর—"কোলাবিধ্বংসিনস্তথা"।

(৬) ৺শাস্ত্রীর সাহিত্যপরিষদের বক্তৃতা দ্রষ্টব্য।

(৭) "রাজন্যকাণ্ড"।

ভূম্যধিকারী হইতে পারিত না।৮ ৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিতেছেন, "কানুনগোর কাজ তো কায়স্থের প্রায় একচেটিয়াই হইয়াছিল।"৯ পুনরায়, সান্যাল বলিতেছেন, "মুসলমান রাজত্বকালে যে-সকল হিন্দু গণ্যমান্য বড়লোক হইয়াছে, তাহারা সকলেই কান্যকুব্জ হইতে সমাগত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থ······আদি বাঙ্গালি মধ্যে একমাত্র রাজা রাজবল্লভ ক্ষমতাপন্ন বড়লোক হইয়াছিলেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য। বৈদ্যের মধ্যে আবার কতিপয় ব্যক্তি অল্প সল্প প্রতিভা দেখাইয়াছেন। সৌ, তিলী, সুবর্ণ বণিক ও কৈবর্ত্ত প্রভৃতির মধ্যে কেহ কেহ বাণিজ্যাদি নিরীহ উপায়ে ধন সঞ্চয় করিয়া তদ্দ্বারা জমিদারী খরিদ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি বিক্রমাদির কোন প্রতিভা দেখা যায় নাই।"১০

এতদ্দ্বারা ইহা বোধগম্য হয় যে, হিন্দু-বাঙ্গলা কার্য্যতঃ তথাকথিত উচ্চজাতীয় লোকদ্বারা পরিচালিত হইত এবং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ নেতারা ক্রমাগত "সমীকরণ" করিয়া নিজেদের সমাজ সুদৃঢ়ভাবে সংঘবদ্ধ করিয়া নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়াইতেছিলেন। রাষ্ট্রের অবস্থা সম্বন্ধে সান্যাল মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন যে, "বাঙ্গলাদেশ মুসলমানদের দ্বারা অধিকৃত হইলেও, দেশের অভ্যন্তরে হিন্দুরাজ্যই চলিতেছিল।"১১ এইজন্যই বাঙ্গলার হিন্দুসমাজকে ভাঙ্গিয়া পুনর্গঠন সম্ভব হইয়াছিল। বোধ হয়, উত্তর-ভারতের আর কোনস্থানেই এই প্রকারের সুবিধা হয় নাই; সেইজন্যই বাঙ্গলার হিন্দু সেই যুগে এত আত্মস্থ হইয়া থাকিতে পারিয়াছিল। এই জন্যই

(৮) "বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস"—১ম সংস্করণ—পৃঃ ৪৬।

(৯) "মধ্যযুগে বাঙ্গলা"—পৃঃ ২০০।

(১০) "বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস"—২য় সংস্করণ, ৪২৫।

(১১) "বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস"—১ম সংস্করণ, পৃঃ ৪৬।

সনাতনপন্থীয় ধর্ম্ম বাঙ্গলার হিন্দু-সমাজের প্রত্যেক স্তরে প্রবেশ করিয়া নিজের প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হইয়াছিল।১২

এইযুগে বাঙ্গলায় ক্ষমতাশালী জাতিসমূহ, অর্থাৎ কায়স্থ ও ব্রাহ্মণেরা একটা "Junkerdom" ১৩ স্থাপন করিয়া সমাজে আধিপত্য করিত এবং অন্য সকলকে নিপীড়ন করিত। অর্থনৈতিক কারণ বশতঃ রাষ্ট্র ও সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া ইহারা "জাত মারামারি" ব্যাপারে নিজেদের ক্ষমতা জাহির করিত এবং অন্য জাতিদের অত্যন্ত ঘৃণা করিত। চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এই 'জাতমারা' ব্যাপার অতি ভীষণ ও অসহনীয় হইয়াছিল।১৪ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের 'মেল' ও 'পটী' বন্ধনের ইতিহাস সমস্ত পাঠ করিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একজন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকে মুসলমান সিপাহী আঘাত করিয়াছিল, তজ্জন্য সেই

(১২) রামকৃষ্ণপন্থীয় একজন মাদ্রাজী ব্রাহ্মণবংশের পরিব্রাজক লেখককে বলিয়াছিলেন সমগ্র ভারত ঘুরিয়া তিনি এই তথ্য উপলব্ধি করিয়াছেন যে, কেবল বাঙ্গলাতেই হিন্দু সমাজের সমস্তজাতি ও স্তরের লোক ব্রাহ্মণ্যবাদ (Brahmanism) গ্রহণ করিয়াছে। কথাটা সত্য।

(১৩) জার্ম্মাণীর প্রুশিয়া প্রদেশের প্রতিপত্তিশালী জমিদারদের উপরোক্ত নামে অভিহিত করা হয়।

(১৪) কোন এক গোস্বামিবংশীয় এক প্রাচীন ধর্ম্মগুরু লেখককে বলিয়াছেন যে, গৌড়ের বাদসাহী যুগে ব্রাহ্মণেরা বাদসাহদের নিকট হইতে ঘুস খাইয়া লোকের জাতি মারিয়া বেড়াইত। ইহার অর্থ প্রাঞ্জল, জাতিচ্যুত লোকেরা মুসলমান সমাজভুক্ত হইলে সেই দল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। বাঙ্গলায় যে প্রকারের জাত মারামারি ব্যাপার ছিল, ভারতের অন্যত্র তদ্রূপ হয় নাই। এইজন্য এই ব্যাপারটা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এই অনুসন্ধানের অর্থনৈতিক ব্যাপার ভিত্তির অনুসন্ধান প্রয়োজন। উপরোক্ত ধর্ম্মগুরু লেখককে বলিয়াছেন যে, তাঁহার উক্তির প্রমাণ আছে। শুনা যায় যে বাদসাহেরা অনেক ব্রহ্মোত্তর জমি প্রদান করিয়াছিলেন আর ইহাও শুনা যায় যে "মদতমাস" জমির বৃত্তিভোগী অনেক ব্রাহ্মণবংশ এখনও আছেন। আইন-আকবরী পাঠে ইহা বুঝা যায় যে, মদতমাস বৃত্তি হিন্দুও পাইত। ইহার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই নিজের দলপুষ্টি করা, উদারতা নহে। এই বিষয়ে অনুসন্ধান প্রয়োজন।

ব্রাহ্মণের জাতি নাশ হয়। আর মুসলমানের খানার গন্ধ একদল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের নাকে ঢুকিয়াছিল বলিয়া তাহাদের জাতিপাত হয়। ১৫

এই সময়ে হিন্দু প্রকৃতপক্ষে অর্দ্ধ-স্বাধীনাবস্থায় থাকিয়া একটা **Imperium in Imperio** সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রাচীন গিল্ডগুলি ভাঙ্গিয়া caste বা বর্ত্তমানের গণ্ডীভূত জাতিতে পরিণত হইতেছিল। প্রাচীন কুলজী গ্রন্থাদি পাঠে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, চৈতন্যের পূর্ব্বে বর্ত্তমান সমাজ-বন্ধন সৃষ্টি হয় নাই। তখন মুসলমানদের সংস্পর্শে একদিকে যেমন লোকের জাতিনাশ হইতেছিল, অন্যদিকে কেহ মুসলমান হইলেও যে তাহাকে হিন্দু সমাজে পুনর্গ্রহণ করা হইয়াছে তাহারও দৃষ্টান্ত আছে। যেমন, হরিহর কবীন্দ্রের দোষ তন্ত্রপ্রকাশে লিখিত আছে: "বৃহস্পতিজ গোপাল বন্দ্যো প্রথমে ত্বক্‌চ্ছেদ দোষ ঘটে"।১৬ আবার "খড়দহ মেলের প্রধান কুলীন মুখোটি বংশীয় কামদেব পণ্ডিতের সপ্তপুত্রই নানা দোষে মিশ্রিত ছিল; তন্মধ্যে তাঁহার শ্রীকণ্ঠ নামক পুত্র যবন পরিবাদ এবং তাঁহার আর এক পুত্র ভাস্করের যবনীগমন দোষ।"১৭ এইস্থলের ত্বক্‌চ্ছেদ (circumcision) দোষ ও 'যবন-পরিবাদ' প্রভৃতির অর্থ অতি প্রাঞ্জল। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ইঁহারা এককালে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত কোন কোন ব্রাহ্মণবংশে মুসলমান রক্তও মিশ্রিত হইয়াছিল। যথা, "৩য় শ্লোকের টীকায় কুলতত্ত্বপ্রকাশিনীকার লিখিয়াছেন, 'বসন্ত ইতি বীরভূমিস্থ বসন্ত চৌধুরী তস্য কান্তা জুনিদ্‌খানেন চিরং রমিতা, তজ্জাতা কন্যা কাশীশ্বরসুত-হরিহরেণোঢ়া, তথাচ—

"কাশীসুত হরিহর ফুলিয়ার মুখৈটী।
ভাল বিভা হৈল তোমায় জুমিখানের বেটী" ॥১৮

(১৫) ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর 'বাঙ্গলার জাতীয় ইতিহাস' দ্রষ্টব্য।

(১৬-১৮) ৺নগেন্দ্রনাথ বসুর "বাঙ্গলার জাতীয় ইতিহাস।" 'ব্রাহ্মণকাণ্ড' ৩-৫ অংশ, পৃঃ ৮০, ৮৮, ৮২।

আবার "হাওয়ানি বধোতু সঙ্গাৎ ছকড়েঃ কন্যকাগ্রহাৎ"।১৯ (দোষোল্লাস)। "বিখ্যাত কুলীন পুরাই গাঙ্গুলীর পুত্র শৌরী যবনদোষে কুলচ্যুত হয়েন। পরে…শুভরাজখান শৌরীর কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে হরণ পূর্ব্বক বিবাহ করায় যবনদোষ পাইলেন। প্রবাদ এইরূপ যে, শৌরীর স্ত্রীর গর্ভে যবনের ঔরসে ঐ কন্যা জন্মে"২০ (দোষোল্লাস)। অন্যদিকে, "বুঢ়ন গ্রামে পিতাড়ী বংশে নরসিংহ মজুমদার নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ঋতুধ্বজ নামক এক হাড়ির সহিত তাহার স্ত্রী ভ্রষ্টা হয়, তাহাতে এক কন্যা জন্মে; সেই কন্যা চেতন চট্টবংশীয় ষষ্ঠীদাস বিবাহ করেন। ইহাতেই ঋতুধ্বজী ভাবের উৎপত্তি"।২১

আবার, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণশ্রেণীর মধ্যে 'রোহিলাপটী' মধ্যে ঐ প্রকারের একটা গোলমাল আছে:—

"ভাদুড়ী—

প্রচণ্ড খাঁ রহিলার বনিতা, বাদশাহার দেওযান হয়ে লয়েছিলা। সেই পত্নীর গর্ভজাত চাঁদ, রুই দুই ভাই, দেশে আসি কহে মাতা হাম রহিলাজাই"॥ অবশ্য এইখানে আসল ব্যাপার চাপা দেওয়া হইয়াছে। প্রচণ্ড খাঁকে একজন ব্রাহ্মণ বলিয়া বর্ণনা করা হইযাছে। এই কন্যা রোহিলাখণ্ডে জাত বাঙ্গালা ব্রাহ্মণের কন্যা। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা জানেন যে, এই সময়ে "রোহিলাখণ্ড" বলিয়া ভারতের কোন অংশের নাম ছিল না। এই নামকরণ তাহার বহু শতাব্দী পরে হয়।২২ পক্ষান্তরে "রোহিলাজাই" শব্দটী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আফগানদের পুস্তভাষায় 'জাই' শব্দের অর্থ, 'অমুকের পুত্র, (son of), যেমন 'বরাকজাই' আচাক্

(১৯-২০) ৺নগেন্দ্র বসুর "বাঙ্গলার জাতীয় ইতিহাস" পৃঃ ৯০, ১১০।

(২১) ৺নগেন্দ্র বসুর "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" ব্রাহ্মণকাণ্ড পৃঃ ১৪৪-১৪৫।

(২২) J. N. Sarkar—"Last days of the Moguls" দ্রষ্টব্য।

জাই প্রভৃতি। পুত্রদের মাতা নিশ্চয়ই 'রহিলা' ছিল; সেইজন্য তাহারা রহিলার পুত্র বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। তাহারা নিজেদের 'ভাদুড়ীজাই' বলিয়া পরিচয় দেয় নাই। 'সম্বন্ধনির্ণয়ে' দেবীবরের মেল-বন্ধনের তালিকা হইতে একটি দোষের কথা ৺লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় উদ্ধৃত করিয়াছেন: "একজন ব্রাহ্মণ সুবর্ণবণিক্‌জাতীয়া একটি বিবাহিতা নারীকে কুলের বাহির করিয়া বর্দ্ধমানে পলাইয়া যায়। পরে তাহাদের বংশধরেরা 'ব্রাহ্মণ-সমাজে পরিপাক হইয়া গিয়াছে!২৩

এই সামাজিক অবস্থার মধ্যে সাধারণের অবস্থা কি ছিল, তাহার অনুসন্ধান প্রয়োজন। পূর্ব্বে ভারতীয় সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণী বলিয়া একটা শ্রেণী ছিল না, কিন্তু যদি বা থাকিয়া থাকে তাহার সংখ্যাও অতি অল্প। সাধারণতঃ ধনী জমিদার, ওমরাহ ও তাহাদের কর্ম্মচারি-বর্গ এবং কৃষক ও শ্রমজীবি শ্রেণীসমূহ লইয়া সমাজ সংগঠিত হইয়াছিল। ইবন্ বেটুটা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে যখন এই দেশ পর্য্যটন করিতে আসেন, তখন বাঙ্গলা যেমন একদিকে ধনধান্যে ভরা দেখিয়াছেন, অন্যদিকে তেমন এই দেশের লোকদের খুব গরীব বলিয়াও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপীয় পর্য্যটকেরাও তাহাই বলিয়াছেন।২৪ কবি-কঙ্কণ তাঁহার চণ্ডীকাব্যে ফুল্লরার দুঃখ বর্ণনাকালে বলিয়াছেন, "অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা।" এতদ্ব্যতীত অন্য জাতির সাধারণ লোকদেরও দুঃখ-দারিদ্র্যের তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। সত্যই ৺কালী-প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন "সে-কালে টাকায় পাঁচ মণ ধান্য বিক্রীত হইত, সাধারণ শ্রমজীবির মজুরী চার পয়সারও কম ছিল, তখন তাহারা বস্ত্র ও গৃহের উপকরণ যে ভাল করিতে পারিত তাহা বলা চলে না"।২৫

(২৩) "সম্বন্ধনির্ণয়"—"বারেন্দ্র শ্রেণীর কুল", পৃঃ ৩৬২।

(২৪) Moreland—"India after Akbar"

(২৫) "মধ্য যুগে বাঙ্গলা" পৃঃ ৩৫৫।

পক্ষান্তরে, কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণে নিম্নলিখিত তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ ২৬ মহারাজা

*   *   *   *

দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।

বঙ্গভাগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার॥" ২৭

এতদ্দ্বারা দেখা যায় যে, বাঙ্গলার স্বাধীন বা অর্দ্ধ-স্বাধীন রাজা এবং জমিদারদের দৌলতে ব্রাহ্মণদের অবস্থা ভাল ছিল। এই সময়ে ব্রাহ্মণদের আবদার, অর্থাৎ দাবী-দাওয়া যে অত্যন্ত বেশী হইয়াছিল তাহা ৺রজনী চক্রবর্ত্তী স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ২৮। ৺নগেন্দ্র বসু বলেন, "যতদিন পূর্ব্ববঙ্গ সেনবংশের শাসনাধীনে ছিল, ততদিন পূর্ব্ববঙ্গে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য অপ্রতিহত ছিল……দেশের অধিপতি পর্য্যন্ত তাঁহাদের কথায় উঠিতেন বসিতেন।২৯

এই প্রকারের ব্রাহ্মণ্য-অনুশাসিত এবং উপরের মুষ্টিমেয় লোকদের দ্বারা নিপীড়িত সমাজ মধ্যে চৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন।

১৩

সমাজে প্রতিক্রিয়াশীল প্রচেষ্টা

চৈতন্যের আন্দোলনের পূর্ব্বে দেশে দোর্দ্দণ্ডভাবে মুসলমান শাসন চলিতেছে এবং নানা কারণবশতঃ হিন্দু স্রোতের ন্যায় বিজেতায় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। জগতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাসপাঠে ইহাই উপলব্ধি

(২৬) অনেকের মতে এই পাঠ ভুল, ইহা দনুজ মহারাজা হবে।

(২৭) "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পৃঃ ১২৪ ১২৫।

(২৮) "গৌড়ের ইতিহাস" দ্রষ্টব্য।

(২৯) "বাঙ্গলার জাতীয় ইতিহাস" (৩য় খণ্ড) পৃঃ ৫৪।

হয় যে, এই সকল যুগে মানুষ ধর্ম্মপদ্ধতি দ্বারা নিজের জাতিতত্ত্বগত একতা (ethnic unity) গঠন করিত। মানুষের আদিম অবস্থার টটেমগত (totemistic) বা কৌমগত ধর্ম্ম (Tribal religion) এর ধারা এই সব যুগেও চলিয়াছিল এবং ভারতে আজও পর্য্যন্ত তাহাই চলিতেছে। এইজন্যই হিন্দু অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, তাহার মূলজাতীয় (racial) সমস্ত বাহ্যচিহ্ন পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহাকে ভিন্নজাতীয় লোকে পরিণত করা হয়। নব-প্রকাশিত কবি শেখচাঁদের "রসুল-বিজয়" নামক কাব্যে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা, "ধুতি উতারিয়া তারে ইজের পরাইল। টিকি মুড়াইয়া তারে শিরে টুপি দিল॥ গিলাপ কাড়িয়া তারে পরাইল নিমা। মুছলমান কৈল তারে পড়াই কলিমা" ॥১

বাঙ্গালার এই অবস্থার কালে সমাজের নেতারা কি করিতেছিলেন, তাহাই এস্থলে উপস্থিত অনুসন্ধানের বস্তু।

এরূপ দৃষ্ট হয় যে, চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মান্দোলন কালক্রমে সমাজের নিম্নস্তরে গিয়া পৌঁছায়। ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, এই আন্দোলন প্রথমে একটি পণ্ডিতমণ্ডলী ও অভিজাতশ্রেণীর লোকদের মধ্য দিয়া আরম্ভ হয়। ইহাদের সাধারণে বিদ্রূপ করিত এবং ইহাদের উপর অত্যাচারও (persecution) চলিত। অপর দিকে দেখা যায় যে, সমাজের স্থিতিশীল অংশ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সমাজের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা করে।

এই যুগটি বাঙ্গলার পক্ষে একটি যুগসন্ধিক্ষণ। পুরাতন সমাজ ভাঙ্গিয়াছে এবং বর্ত্তমানের সমাজ তখনও এই রূপ পরিগ্রহণ করে নাই। দেখা যায়, এই সময়ে সমাজের স্থিতিশীল অংশের মুখপাত্র হইয়া পণ্ডিত রঘুনন্দনের আবির্ভাব হয়। রঘুনন্দনের নামে

(১) মুহম্মদ এনামুল হক—"কবি শেখচান্দ", সা, প, পত্রিকা ৪৩, ভাগ ৩য় সংখ্যা।

অদ্ভুত ধারণা এই দেশে প্রচলিত আছে। একদল বলেন, তিনিই বাঙ্গলার হিন্দুকে বিধর্ম্মীকরণের হাত হইতে বাঁচাইয়াছিলেন; কিন্তু অপর এক দলের মনে তাঁহার নামে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। একটু অনুসন্ধান করিলে প্রতীত হইবে যে, নবদ্বীপের নব্যস্মৃতি বাঙ্গলার সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বজাতির মধ্যে গৃহীত হয় না। পশ্চিমবঙ্গের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের মধ্যে (গৌরাঙ্গের শিষ্য ভিন্ন) এবং অন্যান্য স্থানের উক্ত জাতিদের কিয়দংশের মধ্যে ইঁহার বিধান চলে। রামনাথ বিদ্যারত্ন বলেন, "রংপুর, ময়মনসিংহ ও নোয়াখালীর কোন কোন স্থানে এবং দুই এক স্থান ব্যতীত শ্রীহট্ট জেলার সর্ব্বত্র প্রাচীন স্মৃতির ব্যবস্থানুসারেই কার্য্যকলাপ পরিচালিত হইয়া থাকে।"২ কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, হিন্দুর মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই গৌরাঙ্গ মতাবলম্বী এবং তাঁহারা প্রায় প্রত্যেক ধর্ম্মানুষ্ঠানে 'গোস্বামিমতে পরাহে' ব্যবস্থা করেন করেন। ইহা হইতে সহজেই প্রতীত হয় যে, চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম প্রত্যেক বিষয়েই ব্রাহ্মণদের বিপক্ষতাচরণ করে।

রঘুনন্দন চৈতন্যের সহাধ্যায়ী ছিলেন। যখন চৈতন্য নূতন ভাবের ভাবুক হইয়া সমাজের পতিতদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি প্রতিক্রিয়ার পাণ্ডা হইয়া দাঁড়ান। তাঁহার পূর্ব্বে শূলপাণির ব্যবস্থা বাঙ্গলায় প্রচলিত ছিল। এই বিধানে মনুর অনুযায়ী চাতুর্ব্বর্ণ্যের মধ্যে বিবাহের ব্যবস্থা ছিল; সান্নিপাত দোষের অনুল্লেখই তাহার প্রমাণ।৩ আবার বিভিন্ন স্থানের লোকও বাঙ্গলার সমাজ মধ্যে স্থান পাইত। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও, পুনরায় সমাজে প্রত্যাবর্ত্তন

(২) সানুবাদ স্মৃতিসন্দর্ভঃ প্রথমখণ্ডম্: রামনাথ ভট্টাচাৰ্য্য বিদ্যারত্নবিরচিত। পৃঃ ১

(৩) সা. প, পত্রিকায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

করিতে পারিত ; এমন কি মুসলমান রক্তও জ্ঞাতসারে ব্রাহ্মণসমাজে প্রবেশ করিয়াছিল। ৺পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, বিভিন্ন কুলপঞ্জিকা পাঠ করিয়া তিনি এই তথ্যে উপনীত হইয়াছেন যে, পাঠানে কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণকন্যা হরণ করিয়াছে, আর ব্রাহ্মণও পাঠান-কন্যা হরণ করিয়াছে।৪ চৈতন্যের আবির্ভাবের পর হইতে সমাজ বর্ত্তমান আকার পরিগ্রহ করে। এই সময় হইতেই হিন্দুসমাজ অচলায়তনরূপ পরিগ্রহণ করে। কেন সমাজ এই আকার পরিগ্রহণ করে, ইহাই অনুসন্ধানের বস্তু।

দেবীবর ১৪০২ শকে, অর্থাৎ ১৪৮০ খ্রীঃ অব্দে মেলবন্ধন প্রবর্ত্তন করেন (ইহার পাঁচ বৎসর পরে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন)।৫ সেই সময় হইতে রাঢ়ী ব্রাহ্মণদের পাতিত্যদোষ দূর হয়। আর এই যুগেই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের পটীবন্ধন হয়। আবার হুশেন শাহের সময়েই মালাধর বসু দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলীনদের একজায়ী করেন। ইহার পূর্ব্বে দ্বিজ বাচস্পতির তত্ত্বাবধানে স্বাধীন নরপতি দনুজমর্দ্দনদেব বঙ্গজ কায়স্থদের সমীকরণ করেন। এই সব কারণবশতঃ বাঙ্গলার সমাজ নূতন রূপ পরিগ্রহণ করে। কথিত আছে, মৈথিলী দ্বিজবাচস্পতি ও নবদ্বীপের রঘুনন্দন উভয়েই খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীতে বাঙ্গলার সমাজে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন।৬ রঘুনন্দনের প্রধান কর্ম্ম, চৈতন্যের আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ হিন্দুর সমাজপরিচালনার জন্য তিনি "অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব" লিখেন। এই পুস্তক প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তক ও স্মৃতিসমূহের একটি সার (Digest)। কিন্তু এতদ্দ্বারা তিনি প্রাচীন

(৪) অধুনালুপ্ত বঙ্গবাণীতে 'বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক প্রবন্ধসমূহ দ্রষ্টব্য

(৫) ৺নগেন্দ্রবসু—"ব্রাহ্মণ কাণ্ড" ৩য় অংশ পৃঃ ১৭৩

(৬) ৺নগেন্দ্র বসু "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" (বৈশ্যকাণ্ড) ১ম খণ্ড, পৃঃ অনুক্রমণিকা।

মতের দোহাই দিয়া তৎকালীন সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার সমাজবিজ্ঞানের মূলসূত্র তিনি অনুসন্ধান করেন নাই। পুরাতন স্মৃতিসমূহে বর্ণবিভেদ প্রভৃতি যেসব কাল্পনিক কাহিনী (fiction) আছে, সেগুলি তিনি বাঙ্গলার সমাজে জীবন্ত দেখিতে পান নাই। একমাত্র মনুস্মৃতিই যেমন ভারতীয় জাতিতত্ত্ব ও সমাজবিজ্ঞানের চাবিকাঠি নহে, রঘুনন্দনের নব্যস্মৃতিও তদ্রূপ।

এই সময়ে ভারতের সর্ব্বত্র যে সংস্কারান্দোলন চলিতেছিল তাহার ইতিহাস পাঠে ইহাই প্রতীত হয় যে হিন্দু অভিজাত ও পুরাতন পন্থীরা তাহা পছন্দ করিতেন না। তাঁহারা বরং ইহার বিপক্ষতাচরণ করেছিলেন। মুসলমান সমাজেও তদ্রূপ ; সুফী প্রভৃতি সাধকেরা যে হিন্দুর সহিত মিশিয়া দেশে ঐক্য স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন, মুসলমান অভিজাতেরা তাহার বিপক্ষতাচরণ করিতেন। সংস্কারকেরা যেমন সর্ব্ববর্ণের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনে চেষ্টিত ছিলেন, দ্বন্দ্বভাব (dialectic)স্বরূপ তাহার প্রতিকূলে প্রতিক্রিয়াশীল নেতারা সনাতনবাদের নামে বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকেন। একদিকে যখন একদল উদার হয়ে অগ্রগমনশীল হলেন, অন্যদিকে আর একদল প্রতিক্রিয়াশীল হন। এই সময়ে ভারতের অনেক স্থানে বিশিষ্ট পণ্ডিত দ্বারা "নিবন্ধ" নামে নূতন সমাজ ব্যবস্থা লিখিত হতে থাকে। দক্ষিণে হেমাদ্রি, পশ্চিমে কমলাকর ভট্ট ও তাঁহার আত্মীয় নীলকণ্ঠ, বাঙ্গলায় রঘুনন্দনের উদয় হয়। ইহাঁরা সকলেই প্রামাণিক ও ও অপ্রামাণিক নানা প্রকার সংস্কৃত পুস্তক হতে ধর্ম্ম, ব্যবহার ও সামাজিক বিষয়ের মত সংগ্রহ করে তদানীন্তনের ভারতে তাহা প্রয়োগের ব্যবস্থা করেন।[৭] কিন্তু তখনকার সামাজিক বাতাবরণ কি, হিন্দুজাতি কোন অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে সে বিষয়ে তাঁহাদের কোন অনুভূতি ছিল বলে মনে হয় না। তাঁহারা প্রাচীন আদর্শে নিমগ্ন ছিলেন বলেই প্রতীত হয়।

---

(৭) Kane "History of Dharmasastras" Vol 1 pp 359-467.

বর্ত্তমানে একদল সনাতনপন্থীয় লেখক বলেন এই নিবন্ধকারেরাই হিন্দু সমাজকে বিধর্ম্মীকরণের হাত হতে বাঁচাইয়াছেন। কিন্তু সংস্কারকদের কর্ম্মের প্রভাব বিষয়ে ইহাঁরা বিচার করেন না। আসল সত্য কোথায় তাহা নিরপেক্ষ ইতিহাসই বিচার করিবে।

এক্ষণে বাঙ্গলার অবস্থা বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক। চৈতন্যের সংস্কারান্দোলনের সময়েই নবদ্বীপের সনাতনী পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে রঘুনন্দনের উদয় হয়। তাঁহার "অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব" পুস্তকে যে সতীদাহ (৭ক) বিষয়ে ব্যবস্থা আছে এবং যাহাতে অন্যান্য পুস্তকের মতের সঙ্গে তিনি ঋগ্বেদ হতে বক্ষ্যমাণ শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছিলেন ; "ইমা নারীরবিধবাঃ··· আরোহন্ত জলযোনিমগ্নিং" (শুদ্ধিতত্ত্ব ২৬) তাহা উনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হল যে ঋগ্বেদের আসল পাঠ হতেছে—"ইমা নারীরবিধবা··· আরোহন্ত জনয়ো যোনিমগ্রে" (১০, ১৮, ৭)। পুনঃ যে সূক্ত হতে এই ঋক্‌টি উদ্ধৃত করা হয়েছে তাহা শবদাহে প্রযোজ্য হয় না বলেই স্থিরীকৃত হয়েছে। এই সূক্তের ১০, ১১, ১২, ১৩ ঋক্‌গুলি পাঠ করিলে প্রতীত হবে যে, তাহা শবদাহের পরিবর্ত্তে মৃত্তিকাতে সমাহিত করিবারই ব্যবস্থা হত। এই বিষয়ে ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন, সায়নের মতে ১০, ১১, ১২ এই তিন ঋকের তাৎপর্য্য এই যে যখন মৃত ব্যক্তিকে দাহ করিয়া তাহার অস্থি সঞ্চয় করা হয় তখন ঐ ঋক্ কয়েকটি পাঠ করা হয়। কিন্তু মূলে অস্থির উল্লেখ নাই। ঋক্‌গুলি পাঠ করিলে বোধ হয় যেন মৃতব্যক্তির শরীরই মৃত্তিকার নীচে স্থাপন করা হইত।৮ এই সূক্তের ঋক ১৩ বলিতেছে :

(৭-ক) 'সতীদাহ' কখনও সমগ্র হিন্দু সমাজের প্রথা হয় নাই। Zimmer বলেন. ইহা হয়ত একটা কৌমের রাজাদের প্রথা ছিল। কিন্তু তাহার কোন প্রমাণ নাই। কাদম্বরী নামক সংস্কৃত পুস্তকে এই প্রথার বিপক্ষে বিস্তৃত বক্তৃতা আছে। রামায়ণ, ভাস, কালিদাস ও অন্যান্য সংস্কৃত সাহিত্যে, পুরাণসমূহে এই প্রথার বিবরণ নাই। ইহা কোনকালে হিন্দু-সমাজে সর্ব্বজনীন হয় নাই।

(৮) রমেশচন্দ্র দত্ত "ঋক্‌বেদ" ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪২৬।

"তোমার উপর পৃথিবীকে উত্তম্ভিত করিয়া রাখিতেছি; তোমার উপরে এই একটী লোষ্ট্র অর্পণ করিতেছি, তাহাতে তোমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তোমাকে নষ্ট করিতে পারিবে না। এই স্থূণা অর্থাৎ খুটিকে পিতৃলোকগণ ধারণ করুন। যম এই স্থানে তোমার বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দিন।" এতদ্দ্বারা স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, এই সূক্তটি শবদাহে প্রযোজ্য না হয়ে মাটিতে সমাহিত করার সময়েই পঠিত হত। বর্ত্তমানের অনুসন্ধানকারীরা বলিতেছেন যে ঋক্‌বেদে শবদেহ পোড়ান ও কবর দেওয়া উভয় প্রথাই প্রচলিত ছিল। পুনঃ বৈদিক সাহিত্য পাঠে ইহাও অবগত হওয়া যায় যে এই দুই প্রথা ব্যতীত অন্যান্য প্রথাও বর্ত্তমান ছিল।৯ আজকালকার সমালোচকদের মত যে মহীধর, সায়ন প্রভৃতি বেদসমূহের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয় হতে পারে না, তাঁহারা নিজেদের সামাজিক বাতাবরণের প্রতিচ্ছবিই ব্যাখ্যায় সমূর্ত্ত করেছেন। এক কথায় আজ পর্য্যন্ত সকলেই নিজের সামাজিক ও ধর্ম্মজগতের প্রতিচ্ছবিই বৈদিক সাহিত্যে দেখিতে চান।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন রায় ও একদল পণ্ডিত প্রবর্ত্তিত "সতীদাহ প্রথা" নিবারণ প্রচেষ্টা সময়েই এই শ্লোকটির আসল পাঠ ধরা পড়ে। কিন্তু রাধাকান্ত দেব পরিচালিত "ধর্ম্মসভা" ইহার বিপক্ষে দেশে ও বিদেশে রাজদ্বার পর্য্যন্ত তুমুল আন্দোলন চালান যে এই প্রথা শাস্ত্র সম্মত কিন্তু তাঁহারা পরাজিত হন। এই স্থলে সে বিষয়ে আলোচনার স্থান নেই, তাহা অতীত ইতিহাসের ব্যাপার। কিন্তু ধর্ম্মের নামে রঘুনন্দন প্রভৃতির পুস্তকের দোহাই দিয়া বনিয়াদী স্বার্থের দল (Vested interests) কতই সুবিধা গ্রহণ করেছে ও সমাজের উপর অত্যাচার করেছে!

(৯) B. N. Datta "Vedic Funeral customs and Indusvalley Civilization" in "Man in India" Vol 17, No 1 & 2, 1937 দ্রষ্টব্য।

এইসঙ্গে তাঁহার পুস্তকে আর একটী কথা পাই যে তিনি মনু ও বিষ্ণু উদ্ধৃত করে দেখাইয়া বলেছেন: "ইদানীন্তনক্ষত্রিয়াদীনামপি শূদ্রত্বমাহ মনুঃ" (শুদ্ধিতত্ত্ব ৭১)। অতএব ক্ষত্রিয়ের অশৌচ বিষয়ে বিস্তৃত ব্যবস্থা তাঁহার শুদ্ধিতত্ত্বে প্রদত্ত হয় নাই। বৈশ্যদের বিষয়ওে তদ্রূপ, তাঁহাদের বিষয় তিনি বলেছেন: "এবঞ্চ ক্রিয়ালোপাদ্বৈশ্যানামপি তথৈব অম্বষ্ঠাদীনামপীতি জাতিপ্রসঙ্গাদুক্তং" (৭১); তৎপর শূদ্রদের বিষয় তিনি বলিতেছেন: "শূদ্রাণাং মাসিকং কার্য্যং বপনং ন্যায়বর্ত্তিনাং (৭০)। শূদ্রেরা একমাস অশৌচগ্রহণ করিবে।

এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হয় যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বর্ণগত বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হয় নাই। এই স্থলে ইহাও দ্রষ্টব্য যে রঘুনন্দন কেবল বাঙ্গলার কথাই বলিতেছেন না, সাধারণভাবে ভারতের কথাই বলিতেছেন। কিন্তু এই সময়েই নবদ্বীপে বসে আনন্দ ভট্টদ্বারা লিখিত "বল্লালচরিত" গ্রন্থে দৃষ্ট হয় "তত্রানোহ সি বল্লালো বিলোক্য ব্যাকুলং কুলম্। ব্রাহ্মণাশ্চ ক্ষত্রিযাণাং মন্ত্রয়ামাস বৈদিকৈঃ॥ বিবিচ্য বীজমাহাত্ম্যং ততঃ সংস্কারয়ংশ্চ তান্। ব্রহ্মত্বং ক্ষত্রিয়ত্বঞ্চ কল্পয়ামাস সপ্রভুঃ"। (অধ্যায় ২৩। ২১-২৩)। ইহার অর্থ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের ব্যাকুল দেখে বীজমাহাত্ম্য বিবেচনা করে (original stock) সংস্কার করে ব্রহ্মত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব কল্পনা করিলেন অর্থাৎ নূতন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় তৈয়ার করিলেন।

এক্ষণে কথা এই সেই সব ক্ষত্রিয়বংশ বাঙ্গলায় গেল কোথায়? পুনঃ বল্লালচরিতে ইহাও দৃষ্ট হয় "নিগমশ্চ গন্ধিকশ্চ বৈশ্যবংশসমুদ্ভবৌ। শনৈঃ শূদ্রত্বমাপন্নৌ ক্রিয়ালোপাদিহেতুনা" (অধ্যায় ১৯।৪)। এতদ্দ্বারা গন্ধবণিক প্রভৃতি বৈশ্যবর্ণীয় জাতিদেরও বাঙ্গলায় শূদ্র করা হল। কিন্তু "ক্রিয়ালোপ" তথ্যের বিচার কে করেছে বা করিবে? এই পুস্তকের সর্ব্বশেষে বলা হয়েছে: "ক্ষত্রায়াং ব্রাহ্মণাচ্ছেত্রী রাজপুত্রো য উচ্যতে।

সুবর্ণানোপনয়নাদ্বণিজো ব্রাত্যতাং গতঃ (১০)। এইস্থলে সুবর্ণবণিকদের পতিত এবং গন্ধবণিকদের সৎশূদ্র (১১) বলা হয়েছে। পুনঃ গোপ, মালী, তাম্বুলি, কাংসারী, তাঁতী, শংখবণিক, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, নাপিত জাতিদের "নবশায়ক' বলা হয়েছে (১২)। "বল্লালচরিত" যদি চৈতন্যের যুগের লিখিত প্রামাণিক পুস্তক হয় তাহা হলে আমরা বর্ত্তমান বাঙ্গলার সামাজিক স্তরের একটী প্রতিচ্ছবি ইহাতে পাই। কিন্তু এই পুস্তকেও রাজপুত বা ছত্রি জাতির উল্লেখ দেখি, এই ছত্রিরা পুরাতন ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব বলে দাবী করেন। পুনঃ বাঙ্গলায় যদি ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের পাতিত্যহেতু তাহাদের পৃথকসত্ত্বা অস্বীকার করা হয়, ভারতের অন্যত্র তাহার প্রয়োগ হতে পারে না। নিবন্ধকারেরা সমগ্র ভারতের বিষয়ই স্বীয় মন্তব্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। বাঙ্গলার বাহিরে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা আজও নিজেদের পৃথক্‌সত্ত্বা রক্ষা করে আসিতেছেন এবং পাতিত্য দোষ গ্রস্ত নয়। কিন্তু বাঙ্গলায় ইহার ব্যতিক্রম হ'ল কেন? এতদ্দ্বারাই স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, মুসলমানযুগে বিভিন্ন শ্রেণী স্বার্থ পরিচালিত হয়েই ব্যবস্থাসমূহ প্রদত্ত হয়েছিল। অজ্ঞ লোকেরা আজ পর্য্যন্ত তাহা অভ্রান্ত ব্যবস্থা বলেই মেনে নিয়েছে, পুনঃ এতদ্দ্বারা নানা সামাজিক অসন্তোষেরও সৃষ্টি হয়েছে।

এই বিষয়ে ৺নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন, "পাছে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যসন্তান মস্তকোত্তোলন করেন, এই আশঙ্কায় স্মার্ত্তসমাজ কল্পিত 'যমবচন' উদ্ধৃত করিয়া সকলকে জানাইয়াছিলেন, 'এ জঘন্য কলিযুগে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, এই দুইটি মাত্র জাতি বিদ্যমান' (যুগে জঘন্যে দ্বে জাতী ব্রাহ্মণঃ শূদ্র এব তে)"১৩। ইতিপূর্ব্বেই দেখা গিয়াছে যে, বাঙ্গলায় ব্রহ্মক্ষেত্রি, রাজপুত্র

(১০, ১১, ১২, ১৪) "বল্লাল চরিত" (সংস্কৃত) দ্রষ্টব্য।

(১৩) 'বৈশ্যকাণ্ড'—অনুক্রমণিকা, পৃঃ ২ ; কিন্তু বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত পুস্তকে এই বচনটি নেই!

প্রভৃতি জাতীয় লোকের অস্তিত্ব এই যুগের সাহিত্যে পাওয়া গিয়াছে। 'বল্লাল-চরিতে' রাজার আত্মীয় ব্রহ্মক্ষত্রিয় ব্যতীত রাজপুত্রদের কথাও উল্লিখিত আছে।১৪ কাজেই, সেই যুগে এবং রঘুনন্দনের পরেও (প্রেমবিলাসে ব্রহ্মক্ষত্রিদের উল্লেখ আছে) বাঙ্গলায় ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিবার অনেক লোক ছিল, তত্রাচ রঘুনন্দন এক প্রকারে বলিয়াছিলেন, এই প্রদেশে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাই! পক্ষান্তরে, উপরোক্ত শ্লোকটি যে অর্থশূন্য ও মিথ্যা, তাহা প্রমাণিত হয়, যখন দেখা যায় যে, গুর্জ্জর-প্রতিহারদের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত আর্য্যাবর্ত্তে "রাজপুত" বলিয়া একটি জাতি ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করেছেন এবং ব্রাহ্মণেরা তাহা অস্বীকার করেন নাই। পুনঃ যে-বিজয়নগর সাম্রাজ্যের মন্ত্রীরূপে সায়নাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য কার্য্য করিয়াছিলেন, সেখানকার সম্রাট ও শাসকবর্গ নিজেদের ক্ষত্রিয় পরিচয় প্রদান করিতেন, আর সেই অন্ধ্রদেশে আজও "রাজু" নামধারী জাতিটি ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিয়া আসিতেছে। সায়নের দল ইহাতে আপত্তি করে নাই। দক্ষিণে 'ভেল্লাল' বলিয়া আর একটি জাতি ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করে। শ্রীযুক্ত বৈদ্য বলেন, "কলাবাদ্যন্তয়োঃ স্থিতিঃ" (কলিতে কেবল প্রথম ও শেষ বর্ণ আছে), এই শ্লোকটি কোথায় উক্ত হইয়াছে তাহা তিনি খুঁজিয়া পান নাই।১৫ ইহা কমলাকর ভট্ট ১৬ তাঁহার 'শূদ্র কমলাকরে' উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি যে ইহাতে বিশ্বাস করিতেন না, তাহার প্রমাণ তিনি নিজেই দিয়াছেন, যখন তিনি বলিয়াছেন যে, 'পুরাণান্তরে' ইহা উক্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বৈদ্য বলেন, উপরোক্ত পণ্ডিত কর্ত্তৃক উদ্ধৃত শ্লোকটি কল্পিত। তাঁহার

---

(১৫) C. V. Vaidya—"History of Mediaeval Hindu India" Vol II pp 315-316

(১৬) এই কমলাকরেরই বংশধর গাগাভট্ট শিবাজীকে 'ক্ষত্রিয়' বলিয়া অভিষেক করান এবং কেহ কেহ অনুমান করেন যে কায়স্থদের জন্য স্কন্দ পুরাণের 'সহ্যাদ্রি খণ্ড' লিখিয়া প্রমাণ করেন যে, তাহারা 'ক্ষত্রিয়'। Sarkar's 'Shivaji' দ্রষ্টব্য।

মতে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা বৌদ্ধ হওয়ায়, এই কল্পনার উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু ইহাও একটি কল্পনা বলিয়া অনুমিত হয়। বৌদ্ধেরা মুসলমানদের ন্যায় জাতি ভাঙ্গিয়া একটা পৃথক্ সমাজ বা 'জাতি' (ethnic unit) সৃষ্টি করে নাই। তাহারা মনুর শাসনাধীন সমাজেই অন্যান্য হিন্দুর ন্যায় বাস করিত। হয়ত সেই যুগের বাঙ্গলার সামাজিক স্তর (social hierarchy) দেখিয়া এবং দেশে জাতিবিরোধী বিভিন্ন ধর্ম্মের অস্তিত্বও দেখিয়া কিম্বা প্রাচীনকালের ন্যায় বঙ্গদেশে কল্পিত চাতুর্ব্বর্ণ্য বিধানকে আর সমূর্ত্ত না দেখিয়াই এই ঘোষণা জারি হইয়াছিল। ফলে. যে-সব গোষ্ঠী ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্বের দাবী করিত, তাঁহারাও শূদ্র-পর্য্যায়ে অবনমিত হইলেন, কেবল রহিল সমাজের মাথার উপর অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে একমাত্র ব্রাহ্মণ! আর তাহার ক্ষমতা অপ্রতিহত করিবার জন্য নব্যস্মৃতি নানা প্রকারের বিধান জাহির করিল। ৺শাস্ত্রীর মতে[১৭] যাহারা তাহাদের অনুগত হইল, তাহারাই জলাচরণীয় হইল এবং যাহারা পৃথক্ অস্তিত্ব বজায় রাখিল, তাহারাই 'অনাচরণীয় জাতি'রূপে রহিল।

ইহা অনুমিত হয় যে বৈষ্ণবদের পৃথক্‌ব্যবস্থা করিবার জন্যই চৈতন্যের আদেশে গোপালভট্ট ও সনাতন দ্বারা একটী পৃথক্ স্মৃতি পুস্তক লিখিত হয়। এই স্মৃতি পুস্তকের নাম "হরিভক্তিবিলাস"। ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ধর্ম্মাচরণ বিষয়েই কেবল ব্যবস্থা দিয়াছে, কিন্তু সমাজ-পরিচালনা-সম্পর্কিত কোন নূতন অনুশাসন তাহাতে নাই। অবশ্য গোস্বামীরা নিজেদের শিষ্যদের মধ্যে এককালে চৈতন্যধর্ম্মানুযায়ী আচার-ব্যবহারের কিঞ্চিৎ পৃথক্ ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছিলেন ; আর জাতিত্যাগী 'জাত বোষ্টমদের' জন্য পৃথক্ সমাজব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু বৈষ্ণবসমাজের সাধারণের মধ্যে কোন

---

(১৭) The Modern Buddhism and its followers in Orissa"—Introduction p 15

পৃথক্ সমাজব্যবস্থা প্রদত্ত না হওয়ায় তাহারা নব্যস্মৃতির অধীনে আসিয়া পড়ে। বর্ত্তমান সময়ে এই প্রভাব আরও বিস্তারিত হইতেছে। এই জন্য চৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রবর্ত্তিত উদার-পন্থা নিষ্ফল হইয়া যায়। ফলে নব্যস্মৃতির শাসনাধীন হিন্দুসমাজ দ্বিতীয় সামাজিক সমীকরণের (second social integration) পর হইতে অতি কঠোর কূর্ম্মাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

১৪

সাধারণের উপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব

চৈতন্যের প্রেম ও অহিংসা-ধর্ম্ম লোকের মনে কি কোন রেখাপাত করিতে পারিয়াছিল? প্রাচীনকালে বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়গুলি অহিংসাবাদী ছিল এবং অশোকও প্রেমে শত্রু জয় করিবার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু মনে হয়, ব্রাহ্মণ্যবাদীয় পণ্ডিতেরা ইহাকে দুর্ব্বলতার পরিচায়ক বলিয়া নিন্দা করিতেন। কারণ, গর্গ-সংহিতাতে ব্যঙ্গ করিয়া বলা হইয়াছে যে, কেবল :"মোহাত্মারাই বলিয়া থাকে যে, প্রেম দ্বারা শত্রু জয় করা যায়"। এই প্রকারের সমালোচনা দ্বারা যে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, তাহারই ফলে মৌর্য্যসাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইয়া যায়। ব্রাহ্মণ্যবাদীয় পুস্তকসমূহ হইতে এইটুকু বুঝা যায় যে, বর্ণাশ্রমী সনাতনপন্থীরা বরাবরই অহিংসাবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন। বাঙ্গলায় চৈতন্য সেই প্রাচীন অহিংসাবাদকে পুনঃ ফিরাইয়া আনেন। এইজন্য খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর নব-বৈষ্ণবধর্ম্মের আন্দোলনকে ঐতিহাসিকেরা New-Buddhism (নব-বৌদ্ধধর্ম্ম) নামে অভিহিত করেন। বাঙ্গলায় সামন্ততান্ত্রিক যুগের শেষভাগে চৈতন্যধর্ম্মের

অভ্যুত্থান হয়। মুঘল সাম্রাজ্যবাদ যখন বাঙ্গলার সামন্ততন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া দেয়, সেই সময়েই চৈতন্যের ধর্ম্ম চারিদিকে প্রভাব বিস্তার করে। মুঘলযুগে, বাঙ্গালীর ক্ষাত্রবীর্য্যের অন্তর্দ্ধানের পর চৈতন্য-ধর্ম্মের পরিপূর্ণ বিকাশপ্রাপ্তি হয়। চৈতন্যের প্রেমধর্ম্ম বাঙ্গালীকে স্বাধীনতাসমরে প্রবৃত্ত করায় নাই। এই ধর্ম্ম তাহার মধ্যে জাতীয়তার কোন প্রকার উন্মাদনা আনে নাই এবং রাষ্ট্রনির্ম্মাণকার্য্যেও প্রবৃত্ত করায় নাই। উহা শক্তিপূজার ন্যায় "যশো দেহি, দ্বিষো জহি" আকাঙ্ক্ষা মনে জাগায় নাই, বরং তাহার মনে 'other-worldliness', অর্থাৎ 'বাহ্যজগৎ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিষের অতীত' ভাব আনয়ন করিয়াছিল। সমাজতত্ত্ববিৎ Sorokinএর ১ ভাষায় বৈষ্ণবসাহিত্য Ideational, অর্থাৎ যে-সাহিত্যে অদৃশ্য জগৎ, পরীক্ষামূলক জ্ঞান ও বাহ্যেন্দ্রিয়াদির অতীত বস্তু, যাহাতে শব্দ ও মূর্ত্তিসমূহ এই জগতের প্রতীক মাত্র বলিয়া আলোচিত হয়, সেই সাহিত্যের অন্তর্গত। ইহা সামন্ততান্ত্রিক যুগের সাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হওয়া বিধেয়, যদিচ চৈতন্যের আন্দোলনের প্রথমযুগে কিঞ্চিৎ প্রগতিশীলতার ভাব তাঁহার শিষ্যদের রচনাদির মধ্যে পাওয়া যায়।

বৈষ্ণবসাহিত্য অলৌকিক ও অনৈসর্গিক গল্পে পরিপূর্ণ। ২ সম্ভবতঃ এই অলৌকিক গল্পগুলি পূর্ব্ব-যুগের বৌদ্ধদের কাছ হতে গৃহীত হয়। মহাযানী সিদ্ধরা হয় সশরীরে স্বর্গে গমন করিতেছেন না হয়, জগৎ

---

(১) P. Sorokin "Social and Cultural Dynamics," Vol. I. P. p 595-6.

(২) মধ্যযুগে পৃথিবীর সকলধর্ম্মই আলৌকিক উপায়ে ধর্ম্মপ্রচার করিত। ভারতেও এই যুগে ইসলাম এবং সুফী-ধর্ম্ম এই বিষয়ে বাদ যায় না। বরং তাহারা অলৌকিক কর্ম্ম দ্বারা বেশী শিষ্য সংগ্রহ করিত। এ-বিষয়ে এনামুল হকের 'কবি শেখচান্দ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।—সা, পা পত্রিকা, ৪৩ ভাগ—৩ সংখ্যা।

থেকে অন্তর্ধান করিতেছেন। জনসাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল ছিল। ২ক। বিশ্বাসই বৈষ্ণবধর্ম্মের ভিত্তি। মনোহর দাস বলিতেছেন. "মহাপ্রভুর জন্মভূমি শ্রীগৌড়মণ্ডল, সেখানে চাহিয়ে ভক্তি পাণ্ডিত্য প্রবল।" ৩ কিন্তু যুক্তি-বিহীন বিশ্বাস যে ধর্ম্মান্ধতা ও গোঁড়ামীতে পরিণত হয়; বৈষ্ণবসাহিত্যে তাহার অনেক প্রমাণ আছে। "এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে। তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে।" ৪ অধুনা কেহ কেহ বলেন যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম মানুষকে নির্বীর্য্য করে। উড়িষ্যার হালের কোন কোন নেতা বলেন যে, চৈতন্যের ধর্ম্মই উড়িষ্যার অধঃপতনের মূল কারণ। কথাটা একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যে প্রতাপরুদ্র একসময়ে দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন এবং চৈতন্যের অন্তর্দ্ধানের পর বৎসর রথযাত্রার সময়ে চৈতন্যকে দেখিতে না পাইয়া কাঁদিয়া বলিয়াছিলেন,—

"সোঽয়ং নীলগিরীশ্বরঃ সবিভবো যাত্রা চ সা গুণ্ডিচা।

*　　*　　*　　*

সর্ব্বাণ্যেব মহাপ্রভুং বত বিনা শূন্যানি মন্যামহে" ॥৫

—সেই লোকের হাতে কি আর রাজদণ্ড স্থির থাকিতে পারে? তেমনি বন-বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশের পতনের একটি বড় কারণ বীর হাম্বিরের বংশধর যোগেন্দ্র সিংহদেব বৈষ্ণব ধর্ম্মভাবের আধিক্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।৬ Mr. Gait আসাম বুরুঞ্জি হইতে

২ক। এই বিষয়ে B. N. Datta, "Mystictales of Lama Taranatha" দ্রষ্টব্য।

(৩) "অনুরাগবল্লী"—৫ মঞ্জরী, পৃঃ ৭১।

(৪) চৈ, ভ, অন্ত্য; ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

(৫) "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক"।

(৬) Abhoypada Mallik—"History of Bishnupur Raj" দ্রষ্টব্য।

তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া আসামের যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহাতে এই কথা উল্লেখ করিয়াছেন যে, ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে অহম্‌রাজের লড়াইয়ের সময়ে রাজা গৌরাঙ্গের ধর্ম্ম গ্রহণ করার উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁর খুল্লতাত পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে বারণ করিয়া বলেন যে, এই ধর্ম্ম মানুষকে নিবীর্য্য করে। যদি হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে হয়, তবে শাক্তমত গ্রহণ কর। কিন্তু রাজা গোস্বামি-মতই গ্রহণ করিলেন। এখন দেখা যায় যে, এই অহম জাতি প্রকৃতই নির্বীর্য্য হইয়া গিয়াছে।

গৌরাঙ্গের ধর্ম্ম মানুষের মধ্যে রাজনীতিক চেতনা আনয়ন করে না; ৭ প্রেমের আলাপে মনকে দিনরাত বিভোর করিয়া রাখে! ফলে মানুষের মন নীচু সুরেই বাঁধা থাকে। কাজেই তাহার মানসিক দুর্ব্বলতা অবশ্যম্ভাবী। বৈষ্ণব সাধকেরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথার আধ্যাত্মিক ও অতীন্দ্রিয় ব্যাখ্যা দেন; কিন্তু সাধারণের নিকট এই প্রেমের কথা আদিরসেই পরিণত হয়। ভারতের সর্ব্বত্রই 'রাধা-কৃষ্ণের ব্যাপার' একটা হাসি-ঠাট্টার বিষয় হইয়াছে। সংস্কৃত এবং হালের বৈষ্ণবসাহিত্য এই প্রেমের রূপক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অবশেষে Sensuous হইয়া পড়িয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্য erotic and suggestive পদাবলীতে পরিপূর্ণ। কিন্তু অনেকগুলি আবার অতি অশ্লীল। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য ৺গৌর-গোবিন্দ রায় তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম্ম নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, পুলিসের সাহায্যে এই সব পুস্তক বন্ধ করা উচিত। বৈষ্ণব প্রেমধর্ম্মের নামে

(৭) ব্রাহ্মণ্যবাদীয় পুরোহিতবাদের হাত হইতে হিন্দুদের উদ্ধার করাই ছিল চৈতন্যদেবের রাজনীতি—এইরূপ মত নবদ্বীপের কতিপয় গোস্বামী লেখকের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। একজন বলেন,—চৈতন্যের শিষ্যেরা তাঁহার ধারা বুঝে নাই ও গ্রহণ করিতে পারে নাই। কিন্তু ইহা হইতেছে চৈতন্যের "সমাজনীতি"। রাজনীতিক ধারা বৈষ্ণবদের মধ্যে বিবর্ত্তিত হয় নাই।

দেশে অশ্লীলতা ও ব্যভিচারের স্রোতই বহিয়া চলিয়াছে। সহজিয়াদের ঘাড়ে সব দোষ চাপাইয়া দিলে চলে না। সুফী ধর্ম্মও আশিক (প্রেমিক) ও মাসুকের (প্রেমাস্পদ) প্রেম বর্ণনা দ্বারা সাধনা করে। কিন্তু সেইজন্য তথায় নানা প্রকারের কদাচার অনুষ্ঠিত হয় না।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের নামে অনেক বীভৎস প্রক্রিয়াও সম্পাদিত হয়।৮ ৺অক্ষয়কুমার দত্তের "ভারতবর্ষের উপাসক সম্প্রদায়" নামক পুস্তকখানি পড়িলেই ইহা বোধগম্য হইবে।৯ বিমানবাবু তাঁহার পুস্তকে পূর্ব্ববঙ্গে "কিশোরীভজন" প্রথার অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। লেখক শুনিয়াছেন যে, বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানেও ইহার প্রচলন আছে। আর একটি প্রথার কথা এখানে অত্যন্ত দুঃখের সহিত বাধ্য হইয়া উল্লেখ

---

(৮) আজকালকার শিক্ষিত বৈষ্ণব নেতারা আউল, বাউল, দরবেশদের গোঁড়ীয় বৈষ্ণব বলিয়া স্বীকার করিতে চাহেন না। শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী লেখককে বলিয়াছেন, ইহা 'উপধর্ম্ম' অর্থাৎ অপধর্ম্ম! তিনি বলেন, রূপনারায়ণ বলিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্যের একজন শিষ্য তাঁহার উপর চটিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মকে ধ্বংস করিবার জন্য সহজিয়া সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। গোস্বামীদের নিকট হইতে লেখক শুনিয়াছেন যে, উপরোক্ত সম্প্রদায়সমূহের লোকেরা অনেক অমানুষিক কদাচার করেন। বাউলেরা বিষ্ঠা, পুরীষ প্রভৃতি আহার করেন। ইহাদের অন্যান্য কদাচার সম্বন্ধে ৺অক্ষয় দত্তের "উপাসক সম্প্রদায়" পুস্তক দ্রষ্টব্য। ইঁহাদের একটি আচার হইতেছে 'বজ্রোলি' ক্রিয়া। ইহাকে যোগের একটি ক্রিয়া বলা হয়। ইহা দ্বারা বীর্য্যস্তম্ভন করা যায়। বোধহয়, আসল উদ্দেশ্য হইতেছে, মৈথুন-শক্তি বৃদ্ধি করা। লেখক একজন শিক্ষিত যুবকের নিকট শুনিয়াছেন যে, হুগলী জেলায় একজন গুরু আছেন, যিনি এই উপায়ে 'birth control' শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁহার হাজারখানেক শিষ্যও জুটিয়াছে!

নবদ্বীপের মহাপ্রভুর মন্দিরের সেবায়েৎ জনৈক গোস্বামী মহাশয় লেখককে বলিয়াছেন যে, বাউল, দরবেশ সম্প্রদায় নিশ্চয়ই চৈতন্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব। নবদ্বীপে তাঁহারা মহাপ্রভুর মন্দিরে আসেন এবং প্রসাদ ভক্ষণ করেন। ইনি বলেন, ইঁহারা কাপালিক ধর্ম্ম ভাঙ্গিয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন; সেইজন্যই এখনও কদাচার পালন করেন।

(৯) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত যে জঘন্য চক্রের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, বেলুর মঠের ৺নিত্যানন্দ স্বামী লেখককে বলিয়াছিলেন, যে তাঁহার পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমণকালে শুনিয়াছেন যে, ইহা এখনও অনুষ্ঠিত হয়।

করিতে হইতেছে, ইহাকে সাধারণতঃ বলা হয়—"গুরুগাঁই" বা "গুরু-প্রসাদী" প্রথা। বীরভুম জেলায় নাকি ইহাকে "ইন্দুপ্রসাদ" প্রথা বলা হয়। এই প্রথাটি বাঙ্গলার চৈতন্যসম্প্রদায় ও গুজরাটের বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল এবং স্থানে স্থানে বোধ হয় ইহা এখনও আছে। এই প্রথানুসারে বিবাহিতা নারী যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, প্রথমে তাহাকে গুরুর নিকট প্রেরণ করিতে হয়। ইহা প্রাচীন ল্যাটিন Jus primus noctis বা Right of First Nightএর অনুরূপ। "হুতম পেঁচার নক্সা" নামক পুস্তকে উল্লিখিত আছে যে, মেদিনীপুরের ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলের দিকে এই প্রথা প্রচলিত আছে। উক্ত পুস্তকে বলা হইয়াছে যে, অনেকস্থলে গোস্বামীরা মার খাইয়া তবে এই প্রথানুযায়ী দুষ্কার্য্য হইতে বিরত হন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে লেখকের কোন এক রাজ-কর্ম্মচারী বন্ধু তাহাকে বলিযাছিলেন হে, তিনি মেদিনীপুরের জঙ্গলমহলে এই প্রথার কথা শুনিয়া আসিয়াছেন। সেখানে গোস্বামী এবং জমিদার উভয়ের নিকট কন্যাকে প্রেরণ করিতে হয়।১০ হালে লেখক ২৪ পরগণার সুন্দরবন প্রভৃতি অঞ্চলে কোন-কোন জাতির মধ্যে উক্ত প্রথা আছে বলিয়া সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। মাহিষ্য জাতীয় কৃষিজাবী একজন বৃদ্ধ তাহার নিকট প্রথমে বলেন যে, তাহাদের জাতির মধ্যে এই প্রথা রহিয়াছে; কিন্তু শেষে বলেন যে, এই প্রথা হালে উঠিয়া গিয়াছে। এই জাতীয় লোকেরা মেদিনীপুর হইতে আসিয়া এই অঞ্চলে বসবাস

(১০) এই প্রথা উড়িষ্যা এবং ময়ূরভঞ্জে আগে ছিল। রাজার নিকট স্ত্রীকে পাঠাইয়া দিতে হইত। পরে একটা বালিশ পাঠান হইত। এক্ষণে এই প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। বোধ হয়, মেদিনীপুরেও উড়িষ্যার এই প্রথা বিস্তার লাভ করে। আর্য্য-সমাজের কোন প্রচারক বলেছেন, এই অঞ্চলের তাঁহাদের দলের মাহিষ্য সভ্যেরা অনেক সময়ে স্বীকার করেছেন যে, আর্য্যসমাজভুক্ত হবার পূর্ব্বে তাঁহাদের মধ্যে এই প্রথা ছিল। বর্দ্ধমানের কাটোয়ায় চারি বৎসর পুর্ব্বে এই প্রথা প্রচলনের সংবাদ লেখকের কর্ণগোচর হয়।

করিতেছেন। এই অঞ্চলের একটি মৎস্যজীবী জাতির মধ্যে এই প্রথা আছে বলিয়া লেখক সংবাদ পাইয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ১৮৬২ খৃঃ Bombay High Courtএর একটি মামলায় প্রমাণিত হয় যে, বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত। সাধারণতঃ ইহাকে *Ballavacharyya Defamation Case* বলা হয়।১১

নবদ্বীপের কতিপয় গোস্বামী পণ্ডিত লেখকের নিকট ইহা স্বীকার করিয়াছেন যে, 'গুরুগাই প্রথা' গোস্বামীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত। একজন বলেন, 'গুরুকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিলাম' – ইহাই ছিল ইহার অর্থ। অন্য এক গোস্বামী বলেন, 'গুরুর নিকট হইতে উত্তম পুত্র কামনা করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য'।

এই কদাচারের কথা ঢাকিবার প্রয়োজন নাই। ভারতীয় সমাজে যদি ইহা এখনও বর্ত্তমান থাকিয়া থাকে, তবে উহাকে সমূলে উৎপাটিত করা আশু প্রয়োজন। ধর্ম্মের নামে ভারতে অনেক কদাচার ও পাশবিক ক্রিয়া চলিতেছে! সময় আসিয়াছে, যখন এই সকল কদাচারের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া সমূলে বিনাশ করিতে হইবে। এই প্রকার বীভৎস কদাচার অনুষ্ঠান মধ্যযুগীয় ইউরোপেরও অনেকস্থলেই ছিল। Martin Lutherএর সময়ে কৃষক-বিদ্রোহের একটি কারণ ছিল এই প্রথা। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে ফ্রান্সের কৃষকদের মধ্যেও এই প্রথা ছিল বলিয়া প্রকাশ।১২ ল্যাটিনে এই প্রথার আইনকে বলা হইত Mulcheta Meliorum। জমিদার বা ধর্ম্মযাজকের এই অধিকার প্রয়োগ করার ক্ষমতা ছিল। এককালে ইংলণ্ডে

(১১) এই বিষয়ে বম্বে গভর্ণমেণ্ট রিপোর্ট এবং Dr. Ishwari Prasad—"History of Modern India"—Vallavacharya Case, p 566, "History of the sect of Maharajas in Western India" দ্রষ্টব্য।

(১২) Alison's "History of French Revolution' Part, I.

এবং আয়র্লণ্ডেও এই প্রথা ছিল। Westermarck তাহার "History of Human Marriages" নামক পুস্তকে এই প্রথার উৎপত্তি বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই কুৎসিৎ অনুষ্ঠানটি সামন্ততন্ত্রবাদের সহিত বিজড়িত! মেদিনীপুরের যেসব দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে তাহাতে হয় জমিদার, না হয় পুরোহিতের নাম বিজড়িত আছে।১৩ শুনা যাইতেছে যে, মেদিনীপুরে হালে সূর্য্যোপাসক বলিয়া একটি নূতন সম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছে। তথাকথিত অতি-নিম্ন-জাতিদের মধ্যে তাহারা শিষ্য করিয়া এই প্রথার প্রচলন করিতেছে। জাতির নৈতিকচরিত্র-বিধ্বংসকারী এই কদাচার রাজশক্তির সাহায্যে উঠাইয়া দেওয়া আশু প্রয়োজনীয়!

বস্তুতঃ ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে, যে-চৈতন্যদেব একজন কঠোর নীতিবাদী ছিলেন এবং সামান্য অপরাধে ছোট হরিদাসকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন :

"বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন॥"১৪

তাহারই প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ে দুর্নীতির অপযশ হয়, আর যে-চৈতন্যের শিষ্যদের ত্যাগের কঠোরতা ছিল, যিনি সনাতনকে পশ্চিমের শীতে একটা কম্বল ব্যবহার করিতে দেখিয়া "ভোট-কম্বল-পানে প্রভু চাহে বার বার"১৫ তাহারই প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ে কিনা আজ ভোগের চূড়ান্ত হইতেছে!

(১৩) সিংহভূমের চক্রধরপুরের নিকটস্থ কোন জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে বলিয়া জাতিতত্ত্ববিৎ ৺শরৎচন্দ্র রায় লেখককে বলিয়াছিলেন।

লেখক অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, ইহার নিকটেই একটি উড়িয়া রাজার ষ্টেট আছে। এখানেও উড়িষ্যার সামন্ততান্ত্রিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

(১৪) চৈঃ, ভাঃ, অঃ, ২য় পরিচ্ছেদ।

(১৫) চৈঃ, ভাঃ, মঃ, ২০ পরিচ্ছেদ।

১৫

চৈতন্যধর্ম্মের প্রসার

এক্ষণে দেখিতে হইবে, চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম হিন্দু সমাজে কি প্রকারে প্রসার লাভ করে এবং তথায় কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষাশেষি ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বৈষ্ণবশাস্ত্রসমূহ লেখা সমাপ্ত হইয়াছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে অন্তর্দ্ধান করেন।১ খেতুড়ির মহোৎসবের ভার বহন করেন নরোত্তম ঠাকুরের জ্ঞাতি-ভ্রাতা সন্তোষ দত্ত। ইনি গৌড়ের বাদশাহের অমাত্য ছিলেন। এই সময়ে বীরচন্দ্র গোস্বামী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কর্ণধার হন। ইনিও গৌড়ের বাদশাহের সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার পর বাঙ্গলার রাজনীতিক পরিবর্ত্তন ঘটে। এই যুগটি বাঙ্গলার ইতিহাসের একটী সন্ধিক্ষণ। এই সময়ে বাঙ্গালায় গৌড়ের সুলতানদের অবসান হইয়া, উহা (বাঙ্গালা) মুঘলদের শাসনাধীনে আসে। ভূঁইয়া রাজা বীর হাম্বির, যিনি খেতুড়ীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন, তিনি শেষে মুঘলদের পক্ষাবলম্বন করেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যে এইসব বিষয় সংক্রান্ত কোন সংবাদ জানা যায় না।

মুঘল সাম্রাজ্যবাদ বাঙ্গালার সামন্ততন্ত্রবাদের অবসান ঘটায়। সেই সঙ্গে বাঙ্গালার হিন্দুর গোলেমালে স্বাধীনতা বা অর্দ্ধ-স্বাধীনতা ভোগ করিবার সুবিধাও ঘুচিয়া যায়।২ বাঙ্গলার কায়স্থ জমিদারদের বিদ্রোহের পর কায়স্থজাতির অধঃপতন ঘটে।৩ মানসিংহ রাঢ়ী

(১) "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"—পৃঃ ৩২০।

(২) কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—"নবাবী আমলের বাঙ্গলা"।

(৩) এই বিষয়ে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরোক্ত পুস্তক ও "মধ্যযুগের বাঙ্গলা"; রজনী চক্রবর্ত্তীর "গৌড়ের ইতিহাস" এবং ৺শাস্ত্রীর প্রবন্ধাদি দ্রষ্টব্য।

ব্রাহ্মণ ও অ-বাঙ্গালী হিন্দুদের বাঙ্গলায় জমিপ্রদান করিয়া স্থিতি করায়। রাঢ়ী ব্রাহ্মণেরা মুঘলের তরফদারী করিয়া কায়স্থদের বিরুদ্ধে শত্রুতা সাধন করে। শ্রেণী-সংগ্রাম জাতি-সংগ্রামের (caste-struggle) রূপ ধারণ করে। কায়স্থ-জমিদারেরা প্রায় নির্ম্মূল হয় এবং মুঘল-নিযুক্ত ব্রাহ্মণ জমিদারেরা খাজনা-আদায়কারী ঠিকাদারে পরিণত হয়। যে-রাঢ়ী ব্রাহ্মণেরা অতি দুর্দ্দশাগ্রস্ত ছিল এবং অনেকে স্বহস্তে লাঙ্গল পরিচালনা করিত, তাহারা আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া সমাজে আরও প্রতিপত্তিশালী হইল। তাহাদের সমাজশাসন আরও কঠোর হয়। রঘুনন্দন এই ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রতাপের তরফদারী করিয়া নব্যস্মৃতি রচনাপূর্ব্বক উক্ত প্রাধান্য অপ্রতিদ্বন্দ্বী করিবার প্রয়াস করেন। বাঙ্গলায় ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ব্যতীত আর কোন বর্ণ নাই, এই সিদ্ধান্ত দ্বারা ব্রাহ্মণ্য পুরোহিতবাদ অপ্রতিহত হয়। এইরূপ অবস্থাধীনে চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম জনসাধারণের মধ্যে গৃহীত হইতে থাকে। প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, তথাকথিত উচ্চজাতীয় লোকেরা অতি অল্পসংখ্যকই এই নূতন মত গ্রহণ করে; তন্মধ্যে কায়স্থদের সংখ্যা অতি অল্প। ইহার কারণ এই ধরিতে হইবে যে, কায়স্থদের শ্রেণী-জ্ঞান বা এই ক্ষেত্রে তথাকথিত উচ্চস্তরের জাত্যভিমান। অবশ্য কুলীনগ্রামের বসুগণ চৈতন্যের শিষ্য হন। এইজন্যই চৈতন্য বলিয়াছেন, "কুলীনগ্রামের যে হয় কুকুর, সেহো মোর প্রিয়—অন্য-জন রহু দূর"[৪], এবং কতিপয় কায়স্থ শিষ্য 'গোস্বামী' উপাধিও প্রাপ্ত হন। কিন্তু তৎকালীন সমাজের উচ্চস্তরের জাতিরা এই ধর্ম্মে বিশেষ আকৃষ্ট হন নাই। অবশ্য, ইঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রাচীন প্রথামত বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসক ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা চৈতন্যবাদী হন নাই বা তাঁহাদের বংশধরেরা এখনও নন। তাঁহারা সকলেই স্মার্ত্তমতাবলম্বী।

(৪) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—আদি, ১০ম পরিচ্ছেদ।

অদ্বৈত প্রভৃতি মনীষিগণ সমকালীন সমাজের সমস্যাসমূহ সম্যক্ অবগত ছিলেন। তিনি চৈতন্য হইতেও ৫২ বৎসরের বড় ছিলেন।৫ এরূপ অনুমিত হয় যে, অদ্বৈত চৈতন্যকে উদার মত প্রচার করিবার উপযুক্ত মুখপাত্র মনে করিতেন, "অদ্বৈত বলয়ে, প্রভু মোর এই বর। মূর্খ নীচ পতিতেরে অনুগ্রহ কর"॥ আবার, "অদ্বৈত বলয়ে—'যদি ভক্তি বিলাইবা। স্ত্রী, শূদ্র আদি যত মূর্খেরে সে দিবা'……প্রভু বলে,—সত্য যে তোমার অঙ্গীকার"।৬

ইতিপূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, নবদ্বীপে ব্রাহ্মণদের একটা রাজনীতিক ষড়যন্ত্রের আভাসও জয়ানন্দ দিয়াছেন। বোধ হয়, কতিপয় মনীষীর মনে প্রথমে এই ভাব উদয় হয় যে, 'বাঙ্গলাকে বিদেশীর হাত হইতে রক্ষা কর'; কিন্তু পরে সেই ইচ্ছা 'বাঙ্গালীকে বিদেশীয় ধর্ম্ম হইতে রক্ষা কর', এইরূপে প্রকট হয়। খৃষ্টের জীবনীতেও এইরূপ ভাব পাওয়া যায় এবং হালের ভারতেও এবম্প্রকারের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বোধ হয়, এইজন্যই বৃদ্ধ অদ্বৈত ও বয়স্ক মুরারী গুপ্ত প্রভৃতি চৈতন্যের পক্ষপাতী হন। তাহাদের আদর্শের উপলব্ধির জন্য তরুণ চৈতন্য একটি শাণিত অস্ত্রস্বরূপ ছিলেন। এই আন্দোলনটি একটি ব্যক্তিগত ইচ্ছা-প্রসূত নহে, ইহার বীজ সমাজ মধ্যে নিহিত ছিল। জাতির কতিপয় মনীষীর মনে যেভাব আলোড়িত হইতেছিল, তাহা নবদ্বীপের এই আন্দোলনে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। আর বাঙ্গালার হিন্দুদের বেশীর ভাগের যে অভাব ছিল, তজ্জন্য অবিদিত মনে (sub-conscious mind) সে ইচ্ছা লুক্কায়িত ছিল, তাহা এই আন্দোলনের সুবিধা গ্রহণ করিয়া তাহার সফলতা সম্পাদন করে।

ভারতের অভিশপ্ত শূদ্রবর্ণ নিজের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য চিরকালই

(৫) "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পৃঃ ৩৩৩।
(৬) চৈঃ ভাঃ, ম, ১০ অধ্যায়, ৬ অধ্যায়।

ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়াছে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের দর্শনশাস্ত্র তাহাকে পূর্ব্বজন্ম ও কর্ম্মফল বাদ শিক্ষা দিয়া এবং প্রবল সনাতনী রাজশাসন তাহার মনে দ্বন্দ্ব-ভাব (anti-thesis), অর্থাৎ নিজের অবস্থার প্রতি সংশয়ের চিন্তা উদিত হইতে না দিয়া, তাহাকে চিরকালই নিষ্পেষণ করিয়াছে। আর এই অবস্থার উপর ব্যঙ্গ করিয়া 'তাপের সন্তান'—শোচনাকারী, অতএব 'শূদ্র'—এই আখ্যা প্রদান করিয়াছে। 'নিম্নবর্ণের ব্যবহার-দুঃখ' উচ্চবর্ণের লোকেরা চিরকালই উপেক্ষা করিয়া আসিতেছে। বাঙ্গলার সনাতনপন্থী শূদ্রেরা, বৌদ্ধ, নাথধর্ম্ম ও অন্যান্য ধর্ম্মীয় লোকেরা যখন ইসলামের সাম্যবাদে আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে সেই সমাজে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল, তখন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাঙ্গলায়ও একটি নূতন ধর্ম্মান্দোলন আরম্ভ হইয়া কিঞ্চিৎ সাম্যবাদ বিস্তার করিতে থাকে।

ঐতিহাসিকেরা বলেন, বিপ্লব প্রথমে চিন্তাক্ষেত্রে উদয় হয়, পরে তাহা ব্যাবহারিক কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। আবার, প্রাচীন ও মধ্যযুগে বিপ্লবের ধারা ধর্ম্মের নামেই প্রকট হইয়াছে। বাঙ্গালায়ও চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত আন্দোলন সেই পন্থাবলম্বন করিয়াছিল।

এক্ষণে এই পন্থার কর্ম্মধারার অনুসরণ করা যাক। নবদ্বীপে চৈতন্যের প্রথম প্রচারকার্য্য আরম্ভ হয়। তিনি শঙ্খ-বণিক্, তন্তুবায় প্রভৃতির পল্লীতে নগর সংকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শেষে খোলাবেচা শ্রীধরের বাড়ীতে আসিয়া "লৌহজলপাত্র, তাহে বাহিরের জল। পরম আদরে পান কৈলেন সকল॥"৭ এই উপায়ে তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সংস্কারের প্রথম গণ্ডী ভাঙ্গিলেন।

এই সময়ের অবস্থায় তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া অঙ্গের যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন, "হহা বলি কাঁদে প্রভু ধরণী পড়িয়া, নিজ অঙ্গ উপবীত ফেলিলেন ছিঁড়িয়া"। শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী বলেন, "প্রভুর

(৭) চৈঃ ভাঃ ম, ১৩ অধ্যায়।

উপবীতের উপর যেন প্রথম হইতেই একটা বিরূপ ভাব। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইলেই তিনি অগ্রে নিজের উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিতেন"। ৭ক

তৎপরে তিনি হরিদাসকে বলিতেছেন, "এই মোর দেহ হতে তুমি মোর বড়। তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দৃঢ়।"৮ এতদ্দ্বারা তিনি মুসলমানকেও আলিঙ্গন করিয়া আপনার করেন। এই প্রকারে তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের দ্বিতীয় গণ্ডী ভাঙ্গিলেন। তৎপর, তিনি বলিলেন, "যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতি বুদ্ধি করে। জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবে মরে॥"৯

ইহার পর নিত্যানন্দ সর্ব্বজাতির সহিত আহার-বিহার করিতে লাগিলেন, "সপ্তগ্রামে সর্ব্ব-বণিকের ঘরে ঘরে। আপনে নিতাইচাঁদ কীর্ত্তনে বিহরে।"১০ ইহা কিন্তু গোড়া ব্রাহ্মণদের নিকট দুঃসহ বোধ হইয়াছিল, এমন কি চৈতন্যের নিকটে একজনে নালিশও করিয়াছিল, "কর্পূর তাম্বুল সে ভোজনে সর্ব্বক্ষণ......সোণারূপা যে তাঁহার কলেবর॥... শূদ্রের আশ্রমে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে॥ শাস্ত্রমত মুঞিতান না দেখোঁ আচার॥"১১ চৈতন্যদেব ইহার প্রত্যুত্তরে বলেন, "পতিতের ত্রাণ লাগি তাঁর অবতার। যাহা হইতে সর্ব্বজীব হইবে উদ্ধার॥" ১২

অবশেষে বৈষ্ণব নেতারা তথাকথিত নিম্নতর জাতিদের মধ্যে প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহারা সনাতনীবাদের গোড়ামি ভাঙ্গিয়া দিলেন; চৈতন্য নিজেই তাহা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি পুরীতে একদিন প্রাতঃকালে সার্ব্বভৌমকে জগন্নাথের প্রসাদ খাওয়াইয়াছিলেন—"স্নান-

(৭-ক) শ্রীহরিদাস গোস্বামী—"শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া চরিত" পৃ. ১৯১

(৮) চৈঃ ভাঃ ম, ১০ অধ্যায়।

(৯) চৈঃ ভাঃ, ম, ১০ অধ্যায়।

(১০) চৈঃ ভাঃ অ, ৫ অধ্যায়।

(১১) চৈঃ ভাঃ অ, ৬ অধ্যায়।

(১২) চৈঃ ভাঃ অ, ৬ অধ্যায়।

সন্ধ্যা দন্তধাবন যত্তপি না কৈল। চৈতন্য প্রসাদে মনের সব জাড্য গেল॥
…বেদধর্ম্ম লঙ্ঘি কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥"১৩

এক্ষণে কথা, কাহারা এই নূতন মত ও পথ গ্রহণ করিল? ইতি-পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বেশীর ভাগ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য ব্যতীত অন্যান্য জাতিদের বেশীরভাগই এই পন্থা গ্রহণ করে। এই জাতিগুলির নূতন পন্থাবলম্বনের কারণ কোন অর্থনৈতিক ভিত্তির সন্ধান বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যায় না। "বল্লাল-চরিত" হইতে এইটুকু জানা যায় যে, বল্লালসেন সুবর্ণবণিক্‌দের পতিত করেন এবং কৈবর্ত্তদের উন্নত করেন। এই সঙ্গে মালাকার, কুম্ভকার এবং কর্ম্মকারদের জলাচরণীয় (clean) করিয়া লন। তৎপরে বল্লাল-চরিতে, আনন্দ ভট্টের শ্লোকে জাতিসমূহের এই সংবাদটি পাওয়া যায় যে, "ক্ষত্রিয়া কন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে ছেত্রী (chhetri) জাতির উদ্ভব হয়, ইহাদের রাজপুত্রও বলা হয়। সুবর্ণ বণিকেরা উপবীত হারাইয়া ব্রাত্য হইয়াছে। গোপ, মালি, তাম্বোলী, কংসারা, তাঁতী, শঙ্খিকা, কুলাল, কর্ম্মকার, নাপিত হইতেছে নবশায়ক। তৈলিক, গন্ধিক এবং বৈদ্যেরা সৎশূদ্র (clean Sudrus)। সকল সৎশূদ্র মধ্যে কায়স্থ হইতেছে শ্রেষ্ঠ"।১৪ এই "বল্লাল-চরিত" ১৫১০ খৃষ্টাব্দে লিখিয়া আনন্দভট্ট চৈতন্যের patron নবদ্বীপের রাজা বুদ্ধিমন্ত খানকে উৎসর্গ করেন। এই তালিকাটিতে বল্লালের সময়ের একটা social hierarchy-র সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্দ্বারা এই তথ্যও অবগত হওয়া যায় যে, বল্লালের পূর্ব্বেও এই পেশাগত জাতিগুলি ছিল, এবং চৈতন্যের সময়েও জাতিগুলির এই পর্য্যায় ঠিক ছিল। কিন্তু এতদ্দ্বারা তাহাদের আর্থিক অবস্থার কোন তথ্য পাওয়া যায় না। বৈষ্ণবসাহিত্যে এই তথ্য পাওয়া যায় না যে, আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য তাহারা চৈতন্যের মত গ্রহণ করে। যে

(১৩) চৈঃ চঃ, ম, ৬ পরিচ্ছেদ।
(১৪) "বল্লাল চরিত" দ্রষ্টব্য।

সব বাঙ্গালী মুসলমান হয়, তাহাদের বিষয়ে ইহা বলা যায় যে, নানা প্রকার সুবিধা পাইবার জন্য তাঁহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে। ইস্‌লামীয় আইনানুযায়ী বিজিত বিধর্ম্মী যে 'কাফের-জিম্মী' নামে অভিহিত হয় সে বিজেতার ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে জিম্মীর দেয় ও নানা প্রকার অসুবিধা ও অপমান হইতে বিমুক্ত হয়। নিজের দেশে ঘৃণিত হেয়, অবহেলিত ও অবজ্ঞাত হইয়া বাস করা অপেক্ষা বিজেতার ধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার দলভুক্ত হইয়া তাহার সহিত সাম্য ভোগ করা একটা বড় প্রলোভন। এই প্রকারেই পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিজিত দেশসমূহে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রকারের প্রলোভন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রদান করে নাই। অথচ সমাজের বেশীর ভাগ লোক এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিল।

এইজন্য সাহিত্যে কোন প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও উহা বুঝিতে হইবে যে, নিশ্চয় কোন সুবিধা ইঁহারা পাইয়াছিলেন, যেজন্য তাঁহারা নূতন-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব নেতারা বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণীয় শিষ্যদের বাড়ীতে ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রস্তুত অন্ন আহার করিতে থাকেন; ("স্বর্ণবণিক্ উদ্ধারণ দত্ত ভক্তোত্তম। যাহার পক্কান্ন নিতাই করেন ভক্ষণ") ১৫ তাহাদের সঙ্গে মিশামিশি করিয়া 'ছুঁই-ছুঁই' ভাবটা (don't-touchism) উঠাইয়া দেন। যে-সব জাতীয় লোক পূর্ব্বে সমাজে সম্মান পাইত না, তাহারা এই নূতন সমাজে খাতির পাইতে থাকে। নব্যস্মৃতি যে-প্রকারের বিধি-নিষেধের বাড়াবাড়ি ব্যবস্থা দেয়, গোস্বামীদের প্রদত্ত বিধানে সেই প্রকার কড়াকড়ি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নাই। যে-সব জাতি পূর্ব্বে পুরোহিত পাইত না, তাহারা নিজেদের জন্য ধর্ম্মযাজক পাইতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, চৈতন্যের ধর্ম্ম প্রথম যুগে খানিকটা বিপ্লবী রূপ পরিগ্রহ করায় সম্প্রদায় মধ্যে ধর্ম্মক্ষেত্রে জাতি এবং স্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যতার বিভেদ যায়। পুরীতে বিদ্যানিধিকে স্বপ্নে জগন্নাথ ঠাকুর বলিতেছেন, "মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি নাঞি। সকল

(১৫) প্রেমবিলাস—২৪ বিলাস।

জানিলা তুমি রহি এই ঠাঁঞি।" (চৈঃ ভা, অ, ১০)।" সমাজে ব্যবহার দুঃখগ্রস্থ নিপীড়িত লোকের পক্ষে ইহা একটি বড় প্রলোভন। তৎপরে, চৈতন্যধর্ম্ম একটি অতি সহজ slogan দিলেন, যাহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে—কলিতে হরিনাম ছাড়া গতি নাই—"দার্ঢ্যলাগি 'হরের্নাম' উক্তি তিন বার। জড় লোক বুঝাইতে পুনরেবকার।" ১৬ মুসলমানদের কলমা যেমন অতি সহজবোধ্য ধর্ম্মমন্ত্র (creed), শিখদের যেমন 'অলখ নিরঞ্জন' মন্ত্র, বৈষ্ণবদের জন্য তেমনি অতি সহজবোধ্য ধর্ম্মমন্ত্র 'হরিবোল'। ৺সান্যাল বলেন "বৈষ্ণব মতে তিনবার 'হরিবোল' বলিলেই অতি সহজে সর্ব্বদোষখণ্ডন হইত, এমন কি যবনাদি বিধর্ম্মীও কয়েক বার 'হরিবোল' বলিয়া পরম সাধু বৈষ্ণব হইতে পারিত এবং অনেক মুসলমান সেই উপায়ে হিন্দু বৈষ্ণব হইয়াছিল, কেহ কেহ বা গোস্বামী ও গুরু পর্য্যন্তও হইয়াছিলেন।" ১৭ বৈষ্ণবপদাবলী এই উদারতার নজীর প্রদান করিতেছে—"চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এ রঙ্গ" (মহাজনী পদ) এবং "আচণ্ডালে দিল প্রেম আলিঙ্গন। জাতিবিচার তার না ছিল কখন।" (নাম-সঙ্কীর্ত্তন)।১৮

ইহা ছাড়া পাতিত্যদোষে, জন্মগত দোষে বা অন্যান্য সামাজিক দোষে দুষ্ট লোকেরা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে আশ্রয় পাইতে লাগিল (এখনও পায়)। ইহারাই "জাত বোষ্টম" সমাজ সৃষ্টি করে। জাতিভেদ ও বংশাভিমানের উৎপাতের হাত এড়াইয়া কণ্ঠি-বদল এবং মালসাভোগ দিলেই বিবাহ সিদ্ধ হওয়া, আর প্রয়োজন হইলে এ বিবাহেও "তালাক" দেওয়া একটা মস্ত বড় সুবিধা। এইসব সুবিধার লোভেই নানা প্রকারের লোক বৈষ্ণবমতাবলম্বী হইতে থাকে।

---

(১৬) চৈঃ চঃ আ ১৭ পরিচ্ছেদ।
(১৭) "বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস" পৃঃ ৮৮।
(১৮) শ্রীপঞ্চানন রায়—"বিবেকের দান" পুস্তকে উদ্ধৃত, পৃঃ ১৯৪, ২৮৬।

এক্ষণে বিচার্য্য, বাঙ্গলার ইতিহাসের কোন্ সময়ে এই বিপুল ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ হয়। বৈষ্ণবসাহিত্যে তাহার কোন উল্লেখ নাই। তবে এই অনুমান কি ভুল হইবে যে, বাঙ্গালীকে মুসলমানকরণের প্রকোপ কমিয়া গেলে এবং মুসলমান হইবার প্রলোভন কমিয়া গেলে, ধর্ম্মান্তর-গ্রহণের স্রোতটা মোড় ফিরিয়া বৈষ্ণব হওয়ার দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে? ঐতিহাসিকেরা বলেন, ভারতে মুসলমানকরণ তথাকথিত পাঠানযুগেই বেশী হইয়াছিল। ১৯ পাঠানেরা ইসলামগ্রহণকারী হিন্দুদের নিজেদের কৌমের (tribe) অন্তর্গত করিয়া লইত। বাঙ্গলার কালাচাঁদ ভাদুড়ী ওরফে রাজু ওরফে মহম্মদ ফারমুলী ওরফে কালাপাহাড়; মহারাজ কালিদাস গজদানী ওরফে সোলেমান খাঁ ও তৎপুত্র ঈশা খাঁ মসনদালীই প্রমাণ। ২০ আর বাঙ্গলায় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সফলতা মোগলযুগের শেষেই হইয়াছিল। তখন বাঙ্গলায় মুসলমানকরণের প্রবলস্রোতে ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। কাজেই অনুমান করিতে হইবে যে, ইতিহাসের এই যুগেই বৈষ্ণবধর্ম্মের সফলতাপ্রাপ্তি হয়।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গে কতকগুলি জাতি রহিয়াছে, যাহারা মুসলমানও হয় নাই অথচ বৈষ্ণবধর্ম্মও তাহাদের মধ্যে এখন পর্য্যন্ত প্রবেশ করে নাই। এইগুলি তথাকথিত অন্ত্যজ জাতি; যথা, বাউরি, ভূমিজ, ভুঁইয়া, কোড়া, খয়রা, বাগ্দী, হাড়ী, ডোম ইত্যাদি। ইহারা ধর্ম্মপূজা করে। তাহাদের নিজেদের জাতীয় পুরোহিত আছে; যেমন ডোমদের ডোম পণ্ডিত (ইহারা এখন ব্রাহ্মণ বলিতেছেন), ইহাদের কৌমগত ধর্ম্ম আর নাই। তাহা কেবল কতকগুলি নিষেধবিধি (taboo) দ্বারা ধরা পড়ে। ৺শাস্ত্রীর মতে, ইহারা প্রাচীন বৌদ্ধদের অবশিষ্ট, তজ্জন্য,

(১৯) এই বিষয়ে Dr. Ishwariprasad pp. 283, 305,-515 দ্রষ্টব্য।

(২০) এই বিষয়ে S. Ameer Ali—"The Mussalmans of Bengal", Arnold—"Preaching of Islam" দ্রষ্টব্য।

অনাচরণীয় ; কিন্তু ইহা বিচারসহ না হইতেও পারে। পক্ষান্তরে, পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুজাতির সংখ্যা কম। এই স্থানে মুসলমানকরণের স্রোত অত্যন্ত প্রবলবেগেই প্রবাহিত হইয়াছিল, বৈষ্ণবধর্ম্ম সেখানে পরে যায়। এই তথাকথিত অন্ত্যজদের মধ্যে আজ খৃষ্টান-ধর্ম্ম-প্রচারকেরা যাইতেছেন, এবং কিযদংশে কিয়ৎপরিমাণে সফলকামও হইতেছেন।

এই বিষয়ে শেষ কথা এই, যেসব জাতি কিম্বা জনসমূহ নূতন বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিল, তাহাদের এতদ্দ্বারা আর্থিক উন্নতির এবং সামাজিক পদোন্নতির কোন প্রমাণ বৈষ্ণবসাহিত্যে পাওযা যায় না। বল্লাল-চরিতে প্রত্যেক জাতির সামাজিক পর্য্যায়ের যেস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আজ পর্য্যন্ত তাহাই অটুট আছে। বৈষ্ণবধর্ম্ম সেই সকলজাতির সামাজিক উন্নতি-বিধান, অর্থাৎ সামাজিক পর্য্যায়ের উলটপালট করিতে পারে নাই। ইহার কারণ, নূতন-ধর্ম্ম সমাজ মধ্যে কোন অর্থনীতিক বিপ্লবপ্রচেষ্টা করে নাই। সমাজে স্মার্ত্তবিধানই বলবৎ হইয়া আছে। আজ হিন্দুর মধ্যে যে উদারতা দেখা যাইতেছে এবং পতিতজাতীয় লোককে যে রাষ্ট্রের অতি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা যাইতেছে, তাহা ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়ানুসারেই সম্ভব হইতেছে। এই ক্ষেত্রে চৈতন্য ও নিত্যানন্দকে পতিতপাবন বলার কোন সার্থকতা নাই! মধ্যযুগে যেসব ধর্ম্মসংস্কার আন্দোলন উত্তর-ভারতে উত্থিত হয়, চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত আন্দোলন তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ব্রাহ্মণ্যবাদ-ঘেঁষা। ইহার কারণ বোধ হয় এই যে, ব্রাহ্মণেরাই গোড়া হইতে ইহার কর্ণধার হন। অবশেষে তাঁহারা প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া এই আন্দোলনের মোড় ফিরাইয়া দেন। নামদেব, কবীর, দাদু, রজ্জবজী, পীপা, নানক প্রভৃতির প্রচারিত ধর্ম্ম হইতে এই ধর্ম্মের বিশেষ প্রভেদ ইহাই। কেবল পুরাতন ইষ্টমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বৈষ্ণবমন্ত্র গ্রহণ করিলেই যদি সে উদ্ধার পায়, আর তজ্জন্য মন্ত্রদাতা বা আদিগুরু 'পতিতপাবন' ও 'অধমতারণ' হন, তাহা হইলে ইহাও বলা

যায় যে, অন্যান্য ধর্ম্মের নেতারাও সেই দাবী করেন। এই প্রকার মনস্তত্ত্বকেই ধর্ম্মান্ধ অনুদারতা বা পরমতে অসহিষ্ণুতা (fanaticism) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

এই স্থলে একটি বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক প্রশ্ন সমুপস্থিত হয়। বাঙ্গলায় চৈতন্য প্রবর্ত্তিত আন্দোলন দ্বারা গণসমূহের জাগরণ হইল, তাহা ভারতের অন্যান্যাংশের ন্যায় রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবাহিত হয় নাই কেন? বিপ্লবধারা প্রথমে মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হয় পরে তাহা বাহ্যজগতে সমূর্ত্ত হয়। চৈতন্য প্রবর্ত্তিত বিপ্লবধারা ধর্ম্মে এবং কথঞ্চিৎ সমাজক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকিয়া যাইল কেন? বাঙ্গলার ন্যায় মহারাষ্ট্র ও পঞ্জাবেও বৈষ্ণবভাব প্রভাবান্বিত উদার ধর্ম্মমত প্রচার দ্বারা গণসমূহ জাগ্রত হইয়াছিল, তাহার ফলে পরে, এই উভয় প্রদেশে স্বাধীন রাষ্ট্র উদ্ভূত হতে সক্ষম হয়। কিন্তু বাঙ্গলায় এই আন্দোলন কেবল "বাবাজীর ডৌল"তেই পর্য্যবসিত হয় কেন?

এই বিষয়ে শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিতেছেন—"যদি রামদাস না আসিতেন তবে মহারাষ্ট্রের অবস্থা হইত অনেকাংশে চৈতন্যের বঙ্গদেশ বা নানকের পঞ্জাবের মতন। রামদাস আসিয়া সন্তদিগের উপদিষ্ট ভক্তি-নিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগের সহিত কর্ম্মের যোগ করিয়া দিলেন। মারাঠা স্বাধীন রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য প্রস্তুত হইল। পঞ্জাবে কিছুকাল পরে ভাগ্যক্রমে গুরুগোবিন্দ আবির্ভূত হইয়া নানকের উপদিষ্ট ভক্তির সহিত উদ্যম ও পুরুষকারের মিলন ঘটাইলেন। পঞ্জাব রণজিৎ সিংহের জন্য প্রস্তুত হইল। বঙ্গদেশে কেহ চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তিতে কর্ম্মের ডোরে বাঁধিতে আসিল না, বঙ্গদেশ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় জীবন জানিল না"।

শ্রীচারুচন্দ্র দত্তের এই সমাজতাত্ত্বিক তুলনার তথ্য অতি মূল্যবান। বাঙ্গলায় চৈতন্য প্রবর্ত্তিত গণ-আন্দোলন (Mass movement) জাতীয় কর্ম্ম হতে বিচ্যুত হয়ে এবং জাতীয় আদর্শে ভাবুক নেতার অভাবে "নেড়ানেড়ীর কীর্ত্তনে" পর্য্যবসিত হল। এই আন্দোলনের স্রোত অর্দ্ধ

পথেই বিশুষ্ক হয়ে যায়। জাতীয় কার্য্যকারণের জ্ঞানের অভাব বাঙ্গলা আজও ভোগ করিতেছে।২১

১৬
বৈষ্ণব সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বাঙ্গলায় হিন্দুর মধ্যে বৈষ্ণবের সংখ্যা বেশী ; কিন্তু অনুসন্ধান করিলে ইহা জানা যাইবে যে, সকল বৈষ্ণব চৈতন্যমতাবলম্বী নন। বাঙ্গলায় বৈষ্ণব ধর্ম্ম নূতন নহে, প্রাচীনকালেও ইহা প্রচলিত ছিল। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির মিউজিয়মে যে-সব প্রাচীন দেবমূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে সূর্য্য আর তাঁহার পূজারীকে মধ্য-এশিয়ার বেশধারী পুরুষ বলিয়া বেশ চিনিতে পারা যায়। কিন্তু বিষ্ণুমূর্ত্তি খাঁটি বাঙ্গালীর মুখের ছাঁচে গঠিত হইয়াছে। অদ্বৈতাদির দৃষ্টান্তেই দেখা যায় যে, বৈষ্ণবধর্ম্ম তৎকালে বাঙ্গলায় অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু চৈতন্য আসিয়া একটি নূতন স্রোত প্রবাহিত করেন, এবং নিত্যানন্দ, নরোত্তম ঠাকুর প্রমুখ নেতারা সেই স্রোতকে একটি বিশিষ্ট খাতে প্রবাহিত করিয়া লইয়া যান। এই স্রোতের কর্ণধার হইলেন পরে গোস্বামী প্রভুদের দল। কিন্তু সকল বৈষ্ণব আজ গোস্বামীর শিষ্য নন। অনেক বৈষ্ণব আছেন যাহারা নিজেদের কৃষ্ণমন্ত্রের উপাসক বলেন, কিন্তু গোস্বামিমতে পরাহের কোন সম্পর্ক রাখেন না। পূর্ব্ববঙ্গের নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, সুন্দরবন অঞ্চলের অন্যান্য জাতিদের মধ্যে গোস্বামি-কুলের কোন সংশ্রব নাই ; গোস্বামি-মতের আচরণও তাঁহারা প্রতিপালন করেন না। লেখক নিজে চব্বিশ পরগণার পৌণ্ড্রদের গলায় মালা পরিতে দেখিয়াছেন এবং তাহাদের বাড়ীতে মুরগী চরিতে ও খাইতে দেখিয়াছেন!

(২১) শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত "রামদাস ও শিবাজী", পৃঃ ১৩১-১৩২।

এই প্রকারের বৈষ্ণবদের গুরুরা নিজেদের কৃষ্ণমন্ত্রের উপাসক বলেন; তাঁহাদের সহিত হরিভক্তি বিলাসের বিধানের কোন সম্পর্ক নাই। হয়ত কোনকালে তাঁহাদের সহিত গোস্বামীদের গুরুশিষ্যপরম্পরায় কোন সম্পর্ক ছিল, কিন্তু সেই যোগসূত্র আজ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এবং ইঁহারা আজ স্বতন্ত্র হইয়া কার্য্য করিতেছেন। এই শেষোক্তেরা কোন সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন তাহা বিশেষভাবে অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু।

এই যুগে দেখা যায়, দুই প্রকারের বৈষ্ণব আছেন। যথা, বর্ণাশ্রম সমাজের অন্তর্গত বৈষ্ণব ও সমাজের বাহিরে অবস্থিত জাত-বৈষ্ণব। এই বিভেদ প্রাচীন রীতি ধরিয়া সৃষ্ট হইয়াছে। প্রাচীনকালের বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতির মধ্যেও এই দুই বিভাগ ছিল। বর্ত্তমানের 'আগরওয়াল' জৈন বর্ণাশ্রম-সমাজের অংশ, এবং 'সারোগী' জৈনেরা জাতিত্যাগী। শিখেদের মধ্যেও 'নানকসাহী' ও 'গুরু গোবিন্দসাহীর' এই প্রভেদ। হালের ব্রাহ্মদের মধ্যেও 'আনুষ্ঠানিক' ও 'অনানুষ্ঠানিক' বিভেদও এই প্রকারে সৃষ্ট হইয়াছে। বৈষ্ণবদের মধ্যে যাহারা বর্ণাশ্রম সমাজে বাস করিয়া বৈষ্ণবপন্থাবলম্বী হন, স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহাদের 'স্মৃতি-অনুগত' বৈষ্ণব এবং অন্যদের 'চৈতন্য অনুগত' বৈষ্ণব নামে অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী মহাশয়ের মতে বৈষ্ণবেরা (১) 'সংযমী-বৈষ্ণব' এবং (২) 'জাত-বৈষ্ণব', এই দুইভাগে বিভক্ত। বিপিনবাবু প্রথমোক্তদের Caste-Vaishnavas এবং শেষোক্তদের Out-caste Vaishnavas বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে বলিয়া বলিযাছেন। তাঁহার মতে, উচ্চজাতির লোকেরা যখন এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল, তখন তাহারা[১] নিজেদের সামাজিক পদমর্য্যাদা এই নূতন সংস্কৃতির বিধানের কাছে উৎসর্গ করিতে পারিল না। তাহারা কেবল এই ধর্ম্মের তথাকথিত আধ্যাত্মিক আইনসমূহ (spiritual laws) গ্রহণ

(১) "Bengal Vaishnavism", p. 129.

করে, এবং সামাজিক ও পৌরোহিত্য ব্যাপারে সাধারণ হিন্দুসমাজের বিধানই মানিয়া চলিতে থাকে। এই প্রকারে প্রায় প্রথম হইতেই এই নূতন সম্প্রদায়টি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ক্রমে ব্রাহ্মণেরা এই নূতন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি উচ্চস্থান দখল করিয়া বসে।২ তাহারা সনাতনী-হিন্দু এবং নূতন বৈষ্ণবদের পূজার মধ্যে শালগ্রাম শিলা পূজাপদ্ধতিটি ঢুকাইয়া দেয়। এই প্রতীকটি উভয়সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণ যোগস্থাপন করে। এই প্রকারের সামাজিক বিভেদ বাঙ্গলার নব-বৈষ্ণবধর্ম্মের সামাজিক বাণীর প্রাণকে (spirit of the social message) বিনষ্ট করে! বৈষ্ণবেরাই এতদ্দ্বারা জাতিভারে প্রপীড়িত হইতে থাকে। বৈষ্ণবধর্ম্ম 'অধিকারিভেদ' নামে মধ্যযুগীয় ৩ মতকে (dogma) অস্বীকার করে। এই মতটি মধ্যযুগীয় জাতিভেদরূপ প্রতিষ্ঠান হইতেই উত্থিত হইয়াছিল।৪ এই সকল সংবাদ হইতে এই তথ্যে উপনীত হওয়া যায় যে, চৈতন্য-নিত্যানন্দপ্রবর্ত্তিত আন্দোলন শেষে সর্ব্বগ্রাসী ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ভিতর জীর্ণীভূত হয়। কাজেই ইহাও বলা যাইতে পারে যে, ইহার আসল উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইযা যায়। চৈতন্য রঘুনাথদাসকে নিজের শালগ্রাম পূজা করিতে দিয়া যে আদর্শ দেখাইয়াছিলেন, তাহা হইতে শূদ্র-বৈষ্ণবেরা আজ বঞ্চিত হইয়াছে। আজ বৈষ্ণবসম্প্রদায় মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় পুরোহিতবাদ প্রচণ্ডভাবে বিরাজ করিতেছে, স্মার্ত্তমত আজ তাহাদের উপর চাপিয়া বসিয়াছে। একজন বৈষ্ণব সাহিত্যিক লেখকের কাছে

---

(২) নবদ্বীপের সাধারণে বলেন, গোঁসাইগিরি লাভজনক ব্যবসায় দেখিয়া অনেক চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বৈদিক ব্রাহ্মণ, গোস্বামী হইয়াছেন। কেহ কেহ দৌহিত্রিক সূত্রে বৈষ্ণব মন্দিরের সেবায়েৎ হইয়া "গোস্বামী" হইয়াছেন। এই প্রকারের এক গোস্বামী পণ্ডিত লেখককে বলিয়াছেন যে, তাঁহারা সব শাক্ত !

(৩) নবদ্বীপের শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী মহাশয় লেখককে বলিয়াছেন যে, শূদ্রেরা শালগ্রাম পূজা করিতে পারেন।

(৪) "Bengal Vaishnavism" p. 129.

স্বীকার করিয়াছেন যে, রঘুনন্দনের বিধানকেও তাঁহাদের মানিতে হইতেছে। ইহার অপেক্ষা অধিক অদৃষ্টের পরিহাস আর কি হইতে পারে!

আজ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কি অবস্থা, তাহাই উপস্থিত প্রণিধানের বিষয়। বৈষ্ণবসাহিত্য পাঠে ইহা বেশ স্পষ্টই বুঝা যায় যে, চৈতন্যের পারিষদবর্গের বংশধরগণ পরে নিজেদের পিতৃপদাধিকার করিয়া চারিদিকে শিষ্য করিতে লাগিলেন; তাঁহাদের বংশপরম্পরায় এই কর্ম্ম আজও চলিতেছে। ভিক্ষা-ব্রতধারী নিত্যানন্দ অবধূতের পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী[৫] পাল্কীতে, না হয় অশ্বপৃষ্ঠে শিষ্যবাড়ী যাইতেন! ক্রমে প্রথমযুগের ব্রাহ্মণ ভক্তদের পুত্রেরা শিষ্য করা একটি বিশিষ্ট ব্যবসায়ে পরিণত করেন। আর ভারতে শিষ্য করা একটি উৎকৃষ্ট ব্যবসায়। এই ব্যবসায়ের স্বরূপ বিখ্যাত হিন্দি সাহিত্যিক ৺প্রেমচাঁদজী তাঁহার "গোদান" নামক উপন্যাসে এক পুরোহিত ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া বেশ সুন্দররূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন। যখন গ্রামের একজন লোক এই পুরোহিতকে বলে যে, বাড়ী-বাড়ী ভিক্ষা করিয়া এই উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করার প্রয়োজন কি? তখন সে রাগান্বিত হইয়া বলে "ইহা ভিক্ষা নহে, ইহা একটা বড় জমিদারী।" এই কারণেই ত্যাগী বৈষ্ণবভক্তদের বংশধরেরা গুরুগিরিকে একটা শোষণনীতিমূলক ব্যবসায়ে পরিণত করে। যে শ্রীনিবাস আচার্য্যকে লোকে দ্বিতীয় চৈতন্যের ন্যায় মনে করিত, তিনি একজন রাজাকে শিষ্য করিলেন এবং সংসারও বেশ গুছাইয়া লইলেন: "বীর হাম্বির আদি শিষ্য হৈল বহুজন। বিষ্ণুপুর মধ্যে এক বাড়ী করিয়া দিল।"[৬] আজকালের কুটিল গতিতে বীর হাম্বিরের বংশধরেরা সম্পত্তিবিহীন এবং

(৫) বিমানবাবু বলেন, বীরভদ্রের নাম চৈতন্য ভাগবতে নাই বলিয়া অনেকে তাঁহাকে নিত্যানন্দের পুত্র বলিতে সন্দিহান হন।

(৬) "অনুরাগবল্লী", ৬ মঞ্জরী, পৃষ্ঠা ৯৫।

আচার্য্যের বংশধরেরা খুব বড় জমিদার !৭ চৈতন্যাদির নাম ভাঙ্গাইয়া অনেকে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বেশ রোজগার করিতেছেন। ইহার মধ্যে আশ্চর্য্যের কথা এই যে, চৈতন্যের পারিষদ্‌বর্গীয় গোস্বামী উপাধিধারীদের মধ্যে কায়স্থ, বৈদ্য এবং সদ্‌গোপ জাতীয় কতিপয় লোকও ছিলেন। তাঁহাদের বংশের অধিকাংশ লোকদের গুরুগিরি করিতে শ্রবণ করা যায় না। বোধ হয়, এই কর্ম্ম সনাতনী প্রথানুযায়ী ব্রাহ্মণবংশীয়দের একচেটিয়া হইয়াছে ! উপস্থিত, যিনি দুই তিন পুরুষ গুরুগিরি করিতেছেন, তিনিই নিজেকে "গোস্বামী" বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছেন।৮

আজ স্মার্ত্ত ও গোস্বামী ব্রাহ্মণসমাজ একীভূত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বেকার স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণেরা যেরূপ গোস্বামীদের সহিত আহার ও বিবাহ-সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন, এখন আর তাহা নাই। এখন "বীরভদ্রী-দোষ" ব্রাহ্মণসমাজে পরিপাক হইয়া গিয়াছে। শ্রীপাট কেন্দুবিল্বের শিষ্যগোষ্ঠীর এক ব্রাহ্মণের মুখে লেখক শুনিয়াছেন যে, তাঁহারা গোস্বামীদের বাড়ীর কন্যা গৃহে আনিবেন, কিন্তু তাঁহাদের কন্যা দিবেন না। বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজ হইতেও এই কথা শুনা গিয়াছে।

যখন গোস্বামীদের এই অবস্থা, তখন তাঁহাদের শিষ্যবর্গের কি অবস্থা, তাহাই অনুসন্ধানের বস্তু। তাঁহারাও স্মার্ত্তমতের অনুসরণ করিতেছেন। ভারতে ব্রাহ্মণ্য আচার ও অনুষ্ঠানসমূহ অনুকরণ করা একটা পুরাতন রীতি। যে যত বেশী গোঁড়া ব্রাহ্মণদের চাল-চলন নকল করিবে, সে তত বেশী ভাল 'হিন্দু' বলিয়া সম্মান পাইবে ; ইহাই হইতেছে হিন্দু-সমাজতত্ত্বের একটি তথ্য ! এই উপায়েই আদিমজাতীয় কৌমধর্ম্মীয় (Tribal

(৭) লেখক ইহা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতেছেন।

(৮) নবদ্বীপের কোন গোস্বামী লেখককে এই কথা বলিয়াছেন। ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, আজকালকার অনেক "গোস্বামী", মহাপ্রভুর পারিষদ্ প্রাচীন গোস্বামীদের বংশধর নহেন।

religion) লোকেরা ক্রমশঃ ভাল এবং জলচল হিন্দুরূপে পরিগণিত হইতেছে এবং অবস্থানুসারে "সূর্য্যবংশী" ও "চন্দ্রবংশী" রূপে বিবর্ত্তিত হইতেছে। শূদ্র-মৌর্য্যসাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া ব্রাহ্মণ সুঙ্গ পুষ্যমিত্রের সময়ে মানবধর্ম্মশাস্ত্রের নূতন সংকলন করিয়া ব্রাহ্মণ্যবাদের যে-আদর্শ স্থাপিত হইয়াছে, সেই আদর্শ কঠোরভাবে (strictly) যে-জাতি যত বেশী প্রতিপালন করিবে, সেই জাতির পদও হিন্দু সমাজে তত উন্নত বলিয়া বিবেচিত হইবে। এই অভিব্যক্তি প্রণালীকে 'ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সাম্রাজ্যবাদীয় ধারা' (Brahminical Imperialism) বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। এই ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সাম্রাজ্যবাদ এই বৈষ্ণবদের অভিভূত করিয়াছে। চৈতন্যদেবের ভবিষ্যদ্বাণী,—"কলিযুগে চণ্ডালিনী করিবেক একাদশী" সফল হইতেছে। কায়স্থ ও বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণ্যবাদের সকল আচার ও অনুষ্ঠান প্রতিপালন করেন। এখন নবশায়ক ও অন্যান্য জাতীয় লোকেরা তাহাদের অনুকরণ করিতেছেন! সোজা কথায়, যিনি যত বেশী স্মার্ত্ত আচার গ্রহণ করিতেছেন, তিনিই তত অধিক শুদ্ধ ও উচ্চ হিন্দু বলিয়া খাতির পাইতেছেন।৯

(৯) মনস্তাত্ত্বিক বিচারে 'ছুঁৎমার্গ' ও 'গোঁড়ামী' আভিজাত্য-গর্ব্ব বলিয়া ধরা পড়ে। স্মার্ত্তের বিধানকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকার মূলে প্রথম হইতেই শ্রেণীগত গর্ব্ব লীলা করিতেছে! আজ সেই গর্ব্ব জাতিগত হইয়াছে। নবদ্বীপের কোন স্মার্ত্ত-পণ্ডিত লেখককে বলিয়াছেন যে, 'যতদিন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যেরা রঘুনন্দনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিবে, ততদিন রঘুনন্দনের বিধান বাঙ্গলায় থাকিবে।' অন্যান্যজাতীয় লোকেরা উপরোক্ত জাতিদের আচার, ব্যবহার অনুকরণ করিয়া রঘুনন্দনী বিধানের প্রসার লাভ করাইতেছেন! পক্ষান্তরে অপর এক গোস্বামী পণ্ডিত এই উক্তির প্রত্যুত্তরে লেখককে বলেন, 'ইহা সম্ভব নহে, তাহারা তাঁহাদের শিষ্যবর্গকে হরিভক্তিবিলাসের বিধান মানাইতেছেন, বাঙ্গলায় রঘুনন্দন টিঁকিবে না'। কিন্তু গোস্বামী মহাশয় তাঁহাদের ধনী শিষ্যবর্গের মনস্তত্ত্বের সহিত বোধ হয় পরিচিত নহেন। আজকাল শিক্ষিত ও ধনী নবশায়ক ও অন্যান্য জাতিদের বিধবাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বিধবাদের ন্যায় আচরণ প্রতিপালিত হইতেছে। অন্যান্য বিষয়ে শিষ্যেরা 'গোস্বামিমতে পরাক্ষে' করিলেও স্মার্ত্ত আচারসমূহকে অনুকরণ করিতেছেন!

স্মার্ত্তমতের এই প্রভাব এক্ষণে জাত-বৈষ্ণবদের মধ্যেও বিস্তারিত হইতেছে। ইংরেজী শিক্ষার গুণে তথাকথিত নিম্নতর জাতিসমূহের মধ্যে যেমন একটা শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন শ্রেণী উত্থিত হইতেছে, তজ্জন্য তাহারা স্বীয় জাতির নাম পরিবর্ত্তন করিতেছেন, 'জাত' বৈষ্ণবদের মধ্যেও তদ্রূপ একটি শ্রেণী উত্থিত হইতেছে। পাশ্চাত্য ভাষায় বলিতে হয়, এই সকল জাতির মধ্যে একটা বুর্জ্জোয়া শ্রেণী উদ্ভূত হইতেছে। জাতবৈষ্ণবদের মধ্যে এই বুর্জ্জোয়াশ্রেণী স্বায় সমাজের নামে লজ্জিত হইয়া সাধারণ হইতে আলাদা হইতেছে! এই শ্রেণীর লোকেরা এখন ব্রাহ্মণ ডাকাইয়া বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করান।১০ কোন-কোন 'অধিকারী' নামধারী ব্যক্তি উপবীত ধারণ করিয়া নিজেকে "সাত্বত ব্রাহ্মণ" শ্রেণীয় বলিয়া পরিচিত হইতেছেন; এবং উপস্থিত তাঁহাদের সহিত শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণদের বিবাহ হইতেছে বলে তাঁহারা বলেন; কেহ কেহ নিজেকে কেবল "শূদ্র" জাতীয় বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, কেহ 'দাস' পদবী পরিবর্ত্তন করিয়া ভিন্ন বংশগত পদবী গ্রহণ করিতেছেন! এক্ষণে জাত-বৈষ্ণবেরা বর্ণাশ্রমীয় সমাজে শূদ্রবর্ণের লোক বলিয়া পরিগণিত হইতে চেষ্টা করিতেছেন।১১

এইসব অনুষ্ঠানের ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, চৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় স্মার্ত্তসমাজের কুক্ষিগত হইয়া যাইতেছে!!

(১০) ৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "পণ্ডিত মশাই" উপন্যাসের নায়িকাতে এই ব্রাহ্মণ্য আদর্শানুযায়ী মনস্তত্ত্বই অঙ্কিত হইয়াছে!

(১১) এই তথ্যগুলি লেখক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে ও গোস্বামিদের জিজ্ঞাসা করিয়াই বলিতেছেন।

সমাপ্ত

Bibliography

1. Alison—History of the French Revolution
2. Abhayapada Biswas—History of the Vishnupur Raj
3. Bhupendranath Datta—Mystic Tales of Lama Taranatha
4. Bepin chandra Pal—Bengal Vaishnavism
5. C. V. Vaidya—History of Mediaeval Hindu India
6. Epigraphica Indica—Vol III
7. Haraprasad Sastri—Introduction to N. N. Vasu's Modern Buddhism in Orissa
8. History of the sect of Maharajas in Western India
9. Ishwari Prasad—History of Modern India
10. John. A. Subhan—Sufiism its saints and shrines
11. J. N. Sarkar—Last days of the Moguls ; Shivaji
12. Kashi prasad Jayaswal—History of India. circa, 150 A. D. to 350 A. D
13. Lester. F. Ward—Applied Sociology
14. Max Schmidt—Ethnology
15. Moreland—India after Akbar
16. M. M. Bose—The Post—chaitnya Sahajia cult of Bengal
17. N. G. Mazumdar—Inscriptions of Bengal Vol III
18. N. N. Vasu—History of Kamarupa ; Enthology of the Kayasthas

19. P. Kane—History of Dharmasastras
20. P. Sorokin—Social and cultural Dynamics
21. R. C. Mazumdar—Corporate life in Ancient India
22. S. Ameer Ali—The Mussulmans of India
23. T. W. Arnold—Preaching of Islam
24. Weber—History of Sanskrit Literature
25. Westermarck—History of Human Marriages
26. Wahed Hussein—Mysticism in Islam

উদ্ধৃত পুস্তক তালিকা

1. অক্ষয়কুমার দত্ত — ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়
2 আনন্দ ভট্ট — বল্লাল চরিত
3. ঈশান নাগর — অদ্বৈত প্রকাশ
4. কর্ণপুর — চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক
5. কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় — মধ্যযুগে বাঙ্গলা ; নবাবী আমলে বাঙ্গলা
6. কৃষ্ণদাস কবিরাজ — শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত
7. খোন্দকার ফজলে রবি খাঁ — বাঙ্গলার মুসলমানের আদিবৃত্তান্ত
8. গোপাল ভট্ট — হরিভক্তি বিলাস
9. গোবিন্দ দাস — কড়চা
10. চণ্ডীদাস — মহাজন পদাবলী ; কালীকীর্ত্তন
11. চারুচন্দ্র দত্ত — রামদাস ও শিবাজী
12. চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — শূন্য পুরাণ
13. জয় সোয়াল — আর্য্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্প (ইংরেজী অনুবাদ)

14. জয়ানন্দ — চৈতন্য মঙ্গল
15. জয়চন্দ্র নারং — ইতিহাস প্রবেশ
16. জগবন্ধু ভদ্র — শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিণী
17. দীনেশচন্দ্র সেন — বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ; বৃহদ্‌বঙ্গ
18. দুর্গাচন্দ্র সান্যাল — বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস ✓
19. নিত্যানন্দ দাস — প্রেমবিলাস
20. নরহরি চক্রবর্ত্তী — ভক্তিরত্নাকর
21. নগেন্দ্রনাথ বসু — বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড ; রাজন্য কাণ্ড ও বৈশ্য কাণ্ড
22. পঞ্চানন রায় — বিবেকের দান
23. পদ্মপুরাণ
24. বিমানবিহারী মজুমদার — শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান
25. বায়ু পুরাণ
26. বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী — বসুমতী সাহিত্য মন্দির
27. বিদ্যাপতি — ৺কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ; বসুমতী সংস্করণ
28. বৃন্দাবন দাস — চৈতন্য ভাগবত
29. বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী — গৌড়গণ চন্দ্রিকা
30. মৎস্যপুরাণ
31. মোহন সিং — আদি শ্রীগুরু গ্রন্থ সাহেব
32. মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ — চণ্ডী
33. মনোহর দাস — অনুরাগাবল্লী
34. মুরারি গুপ্ত — কড়চা
35. রামকুমার বর্ম্মা — হিন্দী সাহিত্য কা আলোচনাত্মক ইতিহাস

36. রমেশচন্দ্র দত্ত — ঋকবেদ ✓
37. রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী — গৌড়ের ইতিহাস
38. রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় — বাঙ্গলার ইতিহাস
39. রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য — শ্রীনারদপঞ্চরাত্রং
40. রামনাথ বিদ্যারত্ন — সানুবাদ স্মৃতিসন্দর্ভ
41. লালমোহন বিদ্যানিধি — সম্বন্ধ নির্ণয়
42. লামা তারানাথ — ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস ✓ (জার্ম্মাণ ভাষায় ভাষান্তরিত)
43. শুক্ল — হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস
44. শিশির কুমার ঘোষ — অমিয় নিমাই চরিত
45. সুকুমার সেন — সেখ শুভোদয়া
46. সতীশচন্দ্র রায় — শ্রীশ্রীপদ কল্পতরু
47. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী — গ্রন্থাবলী, বৌদ্ধগান ও দোহা
48. হরিদাস গোস্বামী — শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া চরিত
49. ক্ষিতিমোহন সেন — দাদূ

শুদ্ধিপত্র

পৃঃ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৩	১০	ছত্রনাজি	ছত্রনজি
২৩	১৬	দ্বারে	দ্বারা
২৪	১৫	চৈতন্য ভাগবত, আদি ৫।৫৫—৫৬	চৈতন্য ভাগবত, আদি ৩।৫৫—৫৬
৭১	১৬	কারণ	করণ
৮০	১	সরযূপায়ী	সরযূপারী
৮৫	১৫	indescribale	indescribable
৯২	৫	ঘে	যে
৯২	১৩	প্রকারেয়	প্রকারের
৯৪	১৩	অধ্যুসিত	অধ্যুষিত
৯৪	১৭	বজেতায়	বিজেতার
৯৬	১২	করেন করেন	করেন
১০৮	২০	প্রবন্ধে	পুস্তকে
১৩	পাদটীকা	বাঙ্গলার ইতিহাস	বাঙ্গলার ইতিহাস ২য় সংস্করণ
১৪	”	চৈতন্যভাগবতে	চৈতন্যভাগবতে, আদিলীলা ১।২।২৬৯
৩৭	”	”	১০ম অধ্যায়
৫০	২	চৈতন্যচরিতামৃত	মধ্য লীলা, ১ম পরিচ্ছেদ
৫৯	পাদটীকা		A Literary History of persia vol I

পৃঃ	পাদটীকা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬১	৬	Van kraemer	Von kraemer
৬৪	১৫	বৌদ্ধ দোঁহা ও গান	বৌদ্ধ গান ও দোহা
৬৬-৬৮	১৭-২০, ২৩	Budhism	Buddhism
৭৩	১০	পউলক্ষেই	উপলক্ষ্যেই
৭৮	৪		পৃঃ ৫৩৭
৮৭	৪	বেদ্ধদের	বৌদ্ধদের
৯১	১৬-১৮	জামীয়	জাতীয়
৯২	১৯-২০	জাতীয়	জাতীয়
৯৬	২	ভট্রাচাচাযা	ভট্টাচার্য্য
১০৩	১৪		আনন্দ ভট্টকৃত বল্লালচরিত